প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

মুদ্রণ ও প্রকাশনা
সমবায়ী উদ্যোগ
গংগানগর
উত্তর ২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ
কুমারেশ দাস

একমাত্র পরিবেশক
নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ঝড়ের পাখি : কোন এক কলেজ মেয়ের ডায়েরী থেকে নেয়া আধুনিক চীনের একটি আধুনিক সামাজিক চিত্র।

চীনের ওপর দিয়ে কালচারাল রিভলিউশনের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি মেয়ের আত্মকাহিনী। সহজ, সরল এবং সংযত। ডায়েরী থেকে নেয়া হলেও আসলে এটি একটি গল্প এবং এই গল্পের সব চরিত্রগুলিই কাল্পনিক।

জিয়া হাইসিয়াঙ যখন সাংহাই টিচার ট্রেনিং কলেজে লেখাপড়া করছিলেন সেই সময় (১৯৮১-৮২) তিনি এই গল্পটা লেখেন আগাগোড়া ডায়েরীর আকারে। আমি চীনের ভাষা জানি না, তাই গল্পটার ইংরাজী তরজমার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। চাইনিজ লিটারেচারের কোন এক সংখ্যায় ডায়েরীটা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ভাষান্তর করবার সময় আমাকে আবার মাঝে মাঝে কলম চালাতে হয়েছে।

গল্পটা যেখানে শেষ করলাম তার পরেও ডায়েরীতে কিছু পাতা ছিল। তবে এই গল্পটার জন্য সেগুলোর আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করলাম না। তাই সেদিকে আর মনোযোগ দিলাম না।

ঝড়ের পাখি

বন্দর শহর সাংহাই। আমরা এখানেই থাকি। আমি একজন চীন দেশের মেয়ে। আমার নাম লি জিয়াও। আমি কলেজে পড়ি। আমার বয়স এখন চব্বিশ পার হয়ে গেছে, পঁচিশ চলছে।

আমাকে কলেজেই থাকতে হয়। আমাদের থাকবার জন্য কলেজ ক্যামপাসের ভেতরেই বোর্ডিং আছে, ডরমিটরী আছে, স্টাডিরুম আছে, সবরকম ব্যবস্থাই আছে। তবে শনিবার বিকেল থেকে রবিবারের সমস্ত দিন আমরা ইচ্ছে করলে বাড়ী গিয়ে থাকতে পারি।

আমি যে কলেজে পড়ি আমার বাবাও সেই কলেজের পার্টি সেক্রেটারী। আমাদের দেশে কলেজ, ইউনিভারসিটি, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং যতরকম সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে বা থাকতে পারে, সব প্রতিষ্ঠানেই পার্টির তরফ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠান হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টিই তো সর্বেসর্বা, তাই এই ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানটির ওপর পার্টি প্রতিনিধির কোন কর্তৃত্ব থাকে না তবে একটা প্রভাব অবশ্যই থাকে। আমার বাবারও কলেজের ওপর সেরকম কোন কর্তৃত্ব নেই অথচ কলেজের সব ব্যাপারেই তিনি আছেন। কারণ প্রতি সপ্তাহে তাঁকে পার্টি অফিসে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হয়। পার্টি সেক্রেটারী হিসেবে আমার বাবা থাকবার জন্য একটা ফ্ল্যাট পেয়েছেন। একটা প্রকাণ্ড চোদ্দতলা বাড়ীর তিন তলায় একটা সুন্দর ফ্ল্যাট। সেইটেই আমাদের বাড়ী।

আমি প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার বিকেল বেলা কলেজ থেকে বাড়ী চলে যাই, রবিবার বাড়ীতেই থাকি, সোমবার সকালে আবার কলেজে চলে আসি। আমার মা নেই। বাবাকে একা একা থাকতে হয়, তাই কোন শনিবার বাড়ী আসতে ভুল করি না। বাবার ওপর আমাকে বেশ নজর রাখতে হয়। বাড়ীতে আমার একটা নিজস্ব ঘরও আছে।

আমার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে। তার নাম পাই পিং। আমার চাইতে চার পাঁচ বছরের বড়। ওরই ধারণা ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। ওর এইরকম ধারণার জন্য আমার বাবাই দায়ী। কারণ বাবা পাই পিংকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পাই পিং তাই এখন থেকেই আমার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার চেষ্টা করে। ওকে আমারও ভাল লাগে তবে মাঝে মাঝে ওর ব্যবহার অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন আমার মেজাজও বেশ গরম হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু খুব খারাপ মেয়ে নই। তবে আমার মনে হয় আমার ভেতর একটা তেজ গোপনে ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেই তেজ জেগে ওঠে। তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। তখন অপরকে দুঃখ দেই, নিজেও দুঃখ পাই।

২

পাই পিং-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়া হয়ে যায়। আরম্ভ হয় খুব সামান্য ব্যাপার নিয়ে কিন্তু শেষ হয় একটা মানসিক অশান্তি নিয়ে। এই সেদিনও এইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি বিকেলের দিকে কলেজ থেকে বাড়ী এসেছি। সন্ধ্যার পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবার সঙ্গে বসে এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এমন সময় পাই পিং এল। বাবা কিছুক্ষণ পরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। পাই পিং আমাকে নিয়ে আমার ঘরে এল। ঘটনাটা ঘটল একটা সামান্য ছবি নিয়ে।

পাই পিং একজন পার্টিক্যাডার। একটা কারখানায় জন-সংযোগ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছে। কারখানায় কাজ করলে কি হবে, বেশভূষার পারিপাট্য ওর একটুও কম নয়। ইস্ত্রি করা নীল রঙের জ্যাকেট, তার ভেতর দিয়ে সার্টের ধবধবে সাদা কলার গলার কাছে উঁকি মারছে, হাতের কাপ আঁটসাঁট করে আটকানো। সে দেখতেও সুপুরুষ আর বেশভূষায় সে যে বেশ সৌখিন তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। পাই পিং-এর পোষাক সম্বন্ধে যেসব কথা লিখলাম ও যদি কোনদিন জানতে পারে তাহলে মনে মনে খুশিই হবে।

ঘরে ঢুকেই পাই-এর নজর পড়ল আমার পড়ার টেবিলটার ওপর। টেবিলটার কাচের তলায় রাখা ছবিটার ওপর। একটা সিনেমা পত্রিকার মলাটে ছাপা হয়েছিল সিণ্ডারেলা ও প্রিন্স-এর একটা ছবি। ছবিটাতে প্রিন্স নীচু হয়ে ধনুকের মত বেঁকে সিণ্ডারেলাকে চুমু দিচ্ছে। ছবিটা যে আমি খুব পছন্দ করি তা নয়। তাছাড়া সিণ্ডারেলা গল্পটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কোন গরীবের মেয়ের জীবন এবং ভবিষ্যৎ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কোন ধনী প্রিন্সের করুণার ওপর নির্ভর করবে তা ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগে। ওর ভেতর কেমন যেন একটা বুর্জোয়া গন্ধ আছে। তা সত্ত্বেও ছবিটাকে কাচের তলায় রেখেছিলাম তার রঙের বাহার দেখে। তাছাড়া এই পত্রিকায় এই ধরনের ছবি ছাপা হয়েছে বলে অন্য একটা পত্রিকায় এর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। সেই সমালোচনায় তেমন কোন যুক্তি ছিল না। তাই তা পড়ে আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম, মনে মনে একটু রাগও হয়েছিল। তাই ইচ্ছে করেই পত্রিকার মলাটটা কেটে ছবিটা রেখে দিয়েছিলাম। অযোগ্য সমালোচনার প্রতিবাদ! হয়ত তা-ই হবে। আসলে বিশেষ কিছু না ভেবেই ছবিটা রেখে দিয়েছিলাম।

কিন্তু দুচার দিন পরে আমিই মনে মনে হেসেছিলাম। আমার মত একজন কলেজে পড়া মেয়ের এরকম একটা ছেলেমানুষী করা হয়ত ঠিক হয়নি। আমি এখন প্রাচীন চীনা সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। চাট্টিখানি কথা নয়। আর কাজটা করলাম এক ছোট্ট খুকীর মত। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমি বোধ হয় এখনো সেই ছোটটিই রয়ে

গেছি। এখনো বোধ হয় হঠাৎ কোন লম্বা উঁচু চিমনি অথবা একটা উইণ্ডমিল দেখতে পেলে ডনকুইকসটের মত হাততালি দিয়ে হয়ত উঠব। যাক গে, যা করেছি, করেছি। এর জন্য এখন আর কারো কাছে তো জবাবদিহি করতে হবে না। এখন বলছি এই জন্য যে গ্যাং অফ ফোরের রাজত্ব তো শেষ হয়ে গেছে। তবু মনে মনে ঠিক করে রেখেছি এক সময় ছবিটা বদলে দেব।

পাই-এর নজর পড়ল ছবিটার ওপর। সে ধীরে ধীরে টেবিলটার খুব কাছে গিয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে বললে, ছবিটা তোমার খুব ভাল লাগে?

এই বলে কাচের ওপর চিকন শব্দ তুলে তার একটা আঙুল বোলাতে লাগল।

ওর প্রশ্নের ধরণ দেখে আমিও জবাব দিলাম, ভাল না লাগলে কি আর যত্ন করে রাখা হয়।

আমার কথা শুনে ও ঘুরে আমার দিকে তাকাল। আমি মৃদু মৃদু হাসছিলাম। আমার কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে বললে, সত্যি?

আমি চুপ করে রইলাম।

পাই বললে, ওঃ বুঝেছি। বিরুদ্ধ সমালোচনাটা পড়েই তোমার মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাই না?

এই বলে পাই হাসতে লাগল।

আমার মনের কথাটা ধরে ফেলতে পেরেছে দেখে আমার বেশ একটু রাগ হল। বললাম, কী যা-তা বলছো!

আমাকে বোঝাবার জন্যই হয়ত পাই আবার বললে, ওরকম বিশ্রী সমালোচনা করাটা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু……

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু যাই বলো না কেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটা তোলা হয়েছে তা সত্যি দৃষ্টিকটু, আমাদের রুচিতে বাধে।

ওর কথা শুনে আমি হেসে উঠলাম। বললাম, রুচিতে বাধে! খুব বলেছো। পার্কের বেঞ্চিতে বসে তুমি তোমার উচ্ছ্বাস জানাবার জন্য তুমি কি করেছিলে? তখন তোমার রুচিবোধ কোথায় ছিল? আর শনিবার সন্ধ্যায় যখন বাড়ী ফিরি?

আমার কথা শুনে ও বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, ওসব আলোচনা এখন থাক। তোমার ভালর জন্যই বলছি শোনো। তোমার এখন ছাত্রাবস্থা। তোমার টিচার বা ক্লাশের বন্ধুরা যদি দেখে ফেলে তুমি এইসব ছবি রাখো, তাহলে তারা কি মনে করবে বল তো! প্রকাশ্যে নিন্দা না করলেও অনেক কিছু হয়ত ভাববে, বেশ একটু অশ্বস্তি অনুভব করবে। তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে, সেদিকেও তো নজর রাখা দরকার। কাজেই বেশী রকম ভাবপ্রবণতা বা উচ্ছ্বাস দেখানো উচিত হবে না।

আমি চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকালেম। একটা উপযুক্ত জবাব দেব এইরকম একটা কথা খুঁজছিলাম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই ও কাচের তলা থেকে সিণ্ডারেলার ছবিটা বার করে নিল এবং সেই জায়গায় দ্য ভিনসির আঁকা মোনালিসার একটা ছবি ঢুকিয়ে দিল।

এই কি করছো, বলে আমি ওর হাত থেকে সিণ্ডারেলার ছবিটা কেড়ে নিলাম। একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি হল। আমি হাঁপাতে লাগলাম।

পাই অম্লান বদনে বেশ তৃপ্তি সহকারে বললে, দেখতো, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। দ্য ভিনসির আঁকা ছবি, পলিটিকসের উর্ধ্বে। আর মোনালিসার হাসিটি দেখ, কী অপূর্ব! একেই বলে মহান আর্ট।

আমি মনে মনে ফুলছিলাম। এ কাজটা আমিই করতে পারতাম। ওর এই সর্দারী আমার পছন্দ হল না। তাছাড়া এতখানি সর্দারী করবার অধিকার ও পেল কোথা থেকে। এইসব ভাবছিলাম এমন সময় বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই বাবার নজর পড়ল টেবিলটার ওপর। তিনি হাসি মুখে বলে উঠলেন, কি করতে হবে তা দেখছি বেশ বুঝতে পেরেছো! আমি তো কোন রকম ছবি রাখার বিরুদ্ধে ছিলাম। এখন

দেখছি পাই বেশ সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে। পাই একজন আসল ক্যাডার।

ঘটনাটা তাহলে আকস্মিক নয়, পূর্বকল্পিত। দুজনে পরামর্শ করে এ কাজটা করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! বাবার আস্কারা পেয়েই পাই-এর এত সাহস হয়েছে। আমি ওদের কাছে বেশ ছোট হয়ে গেলাম। পরাজয়ের গ্লানি আমাকে নিস্তেজ করে দিল।

বাবা ও পাই দুজনেই হাসছিল। সঙ্গতি রাখবার জন্য আমিও ওদের সঙ্গে মৃদু হাসবার চেষ্টা করলাম।

পাই পিং এক সময় রেডগার্ডে বাবার অধীনে সেপাই ছিল। তারপর গ্যাং অফ ফোর-এর রাজত্বে বাবার চাকরী যায় এবং পাই একটা কারখানায় সামান্য কর্মচারী হিসেবে একটা কাজ পায়। সেই কারখানাতেই সে দশ বছর কাজ করেছে। গ্যাং অফ ফোর-এর রাজত্বের অবসান হলে সে পার্টিতে যোগদান করে। স্বভাবে নম্র এবং বিনয়ী হওয়াতে সে একটু উঁচু পদে উঠতে পেরেছে।

যাবার সময় আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ও আমাকে একটু আদর করে বললে, লি, আমরা যা কিছু করি তোমার ভালর জন্যই করি। তোমার কোন ক্ষতি হয় এ আমি জীবন গেলেও হতে দেব না। তোমার সুখের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছি।

ঘরে ফিরে এসেও ওর কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগল। রুদ্ধ আবেগে হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। সিণ্ডারেলা ছবিটা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

পাই-এর ওপর খুব রাগ হয়েছিল। এখন আর সে রাগটা নেই। এই ঘটনাটা ভুলে যাওয়াই ভাল।

৩

সোমবার সকালে কলেজ বোর্ডিং-এ চলে এলাম। বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। এসে দেখলাম অন্য মেয়েরা কেউ বাড়ী থেকে তখনো আসেনি। শুধু জিয়া গুইচি একা ডরমিটরে বসে আছে।

আমাকে একা পেয়ে জিয়া গুইচি আমার খুব কাছে এসে বললে, তোমাকে একটা কথা বলব, কাউকে বলে দেবে না তো ?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আবার এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে !

জিয়া একটু লজ্জিতভাবে বললে, তোর তো একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে ?

বললাম, তা আছে।

—তার সঙ্গে কি তোর বিয়ে হবে ?

—হতে পারে।

—তার মানে না-ও হতে পারে ?

—সে তো পরের কথা। তা তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ? আসল কথাটা বলতো।

জিয়া খুব লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা নীচু করে বললে, বড় নারভাস হয়ে যাচ্ছি।

—কেন ?

—একটা ছেলের সঙ্গে কাল বেড়াতে যাব কথা দিয়েছি।

একটু খোঁচা দিয়ে বললাম, ওঃ গেটিং নটি ! ছেলেটাকে কেমন করে পাকড়ালি বলতো ?

একটু সলজ্জ হাসি হেসে জিয়া বললে, না, ঠিক তা নয়। মাসির বাড়ী গিয়েছিলাম। মাসি ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বললে, ছেলেটি খুব ভাল। ওর সঙ্গে ভাল করে আলাপ কর। তারপর তোর যদি ভাল লাগে তাহলে ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

জিয়া গুইচি অতিশয় সাধারণ মেয়ে। গোল গোল চোখ দুটি খুব কাছাকাছি বসানো, মুখখানাও গোলাকার, গায়ের রঙও তেমন উজ্জ্বল নয়। দেখলেই মনে হয় কপালটা যেন ধোঁজ করে রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে হাসতেও পারে। ওর বয়স আঠারোর কাছাকাছি। এই বয়সে অনেক মেয়ের অনেক বয়ফ্রেণ্ড জুটে যায়। ওর এখনো কোন বয়ফ্রেণ্ড জোটেনি। এইটেই বোধ হয় প্রথম। বয়সটাতো বেড়েই যাচ্ছে, বিয়েও একটা করতে হবে কিন্তু যাকে তাকে তো বিয়ে করা যায় না।

আমাদের দেশে আজকাল ছেলে মেয়েদের বিয়ের জন্য বাবা-মাকে বিশেষ ভাবতে হয় না। অনেক আগে সামাজিক পরিস্থিতি হয়ত অন্য রকম ছিল। কিন্তু এখন ছেলে মেয়েরাই নিজেদের বিয়ে নিজেরাই ঠিক করে নেয় এবং ঠিক হয়ে গেলে বাবা মার অনুমতি সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সময় অনুমতির প্রয়োজনও হয় না। তবে জিয়া গুইচি এখনো শিক্ষার্থী, কলেজের ছাত্রী, তাই তাকে আরো কয়েক বছর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে ওর কিন্তু একটা বয়ফ্রেণ্ডও জোটেনি। এই-ই বোধ হয় প্রথম।

জিয়া আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এল কেন তার একটা কারণ হয়তো আছে। আমি কলেজে আসবার আগে সাত আট বছর গ্রামে কাটিয়েছি, তারপর দুবছর একটা কারখানায় কাজ করেছি। তাছাড়া আমার বাবা এই কলেজেই পার্টি সেক্রেটারী এবং আমার একজন বয়ফ্রেণ্ড আছে। তার ওপর একদিন ও সত্যি সত্যি দেখে ফেলেছিল যে আমি একটি ছেলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে বেড়াতে চলেছি। এই নিয়ে ও আমাকে অনেক ঠাট্টা তামাশাও করেছে। তখন ওকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বলেছিলাম, তাতে হয়েছে কি, ওতো আমার বয়ফ্রেণ্ড। তোর নেই বুঝি! নটি গার্ল বলে সেদিন ও আমাকে বেশ এক হাত নিয়েছিল। এসব ভাবতেও বেশ ভাল লাগছিল।

এইসব কারণেই ওর ধারণা হয়ত হয়েছে যে জীবন সম্বন্ধে আমার একটা ভাল অভিজ্ঞতা আছে। তাই বয়সে তিন চার বছরের ছোট হওয়া সত্বেও ও আমার কাছেই পরামর্শ চাইতে এল। আমিও একটু মুরব্বিয়ানা

করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটা কে?

বললে, মাসির বাড়ীতে আলাপ, কয়েক মিনিটের জন্য।

ওর কথায় ঠিক বুঝতে পারলাম না ছেলেটা কেমন। তাই বললাম, আসল কথা কি জানো, এই তোমার প্রথম মোলাকাত। তার মানে তুমি ছেলেটার সম্বন্ধে কিছুই জান না। তাই সবকিছু জানবার চেষ্টা করবে। ওর চাল-চলন ব্যবহার ভাল করে লক্ষ্য করবে। ও এখন কি করে, আগে কি করতো, ওর বাড়ী কোথায়, বাপ মা ভাই বোন এইসব খবর কথায় কথায় জানবার চেষ্টা করবে। প্রথম আলাপে সকলে তাই করে।

জিয়া বললে, এসব কথা প্রায় জানা হয়ে গেছে। ওর বাবা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। ওর মা একটা প্রাইমারী স্কুলে টিচার ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। ও এখন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে কমপিউটার বিভাগে রিসার্চ করছে। আমাদের কলেজেই আছে। তুমিও ওকে হয়ত দেখেছো।

—ওর বাড়ী কোথায়? এসব ব্যাপারে সামান্য খুঁত রাখাও সমীচীন হবে না।

—ওর বাড়ী গান-সু—কথাটা বলতে জিয়া একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু তখনি আবার বললে, মাসি বললেন ওর মা এই শহরেই আছেন আর ও-ও হয়ত এই কলেজেই কাজ পেয়ে যাবে, কারণ ও খুব ভাল ছেলে। পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবেই। তাছাড়া ছোটবেলাটা ওর এইখানেই কেটেছে। পরে অবশ্য গ্রামে মাটি কাটবার জন্য ওকে গান-সু যেতে হয়েছিল।

বেশ ভারিক্কিচালে বললাম, একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না।

জিয়া বললে, তাতে কিছু আসে যায় না। ডিগ্রী পেতে ওর আরো একটা বছর লাগবে। তারপর ও হয়তো এখানেই কাজ করবে। আর যদি বেগতিক কিছু দেখি তাহলে আমিও কম পাত্র নই একদিন বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দেব।

চালাক মেয়ে। অনেক দূর পর্যন্ত ভেবে দেখেছে। তাই বললাম, তুমি ঠিকই করেছো। এইবার আস্তে আস্তে এগোও। দেখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে জিজ্ঞেস করলাম, বয়স কত ?

এমন সময় দরজাটা সশব্দে খুলে গেল এবং চিকন কণ্ঠী জি-লাই ঘরে প্রবেশ করল।

জিয়া বললে, একত্রিশ।

জি-লাই চিকন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি একত্রিশ ?

আমি জিয়া গুইচির দিকে চেয়ে হেসে বললাম, ও কিছু নয়, পায়ের মোজার একটা মাপ।

আমার মনে হল আমার পরামর্শ জিয়ার খুব ভাল লাগেনি। ও হয়ত আরো অনেক কিছু আশা করেছিল। আমি বোধ হয় ওকে সেরকম উৎসাহ দিতে পারিনি। এখন আমি আর নিজের কথা ভাবি না। কেমন যেন নির্বিকার হয়ে পড়েছি। এখন আমার আর লজ্জা করে না, কোন উত্তেজনাও অনুভব করি না, কোন স্বপ্নও দেখি না। আমি নিজেই যেন থার্ড ক্লাস হয়ে যাচ্ছি। তবু জিয়া আমাকে বিশ্বাস করেছে। তাতে বেশ একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করলাম।

৪

আমি রোজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই কলেজের বাগানে মর্নিং ওয়াক করতে যাই। বুধবার সকালেও ঠিক অন্যদিনের মত বাগানে গেলাম। বাগানে যেতে যেতেই জিয়া গুইচির কথা মনে পড়ল। গতকাল তো তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা ছিল। কেমন করে তাদের মধুসন্ধ্যা কাটল জানতে হবে।

বাগানে এসে দেখি জিয়া গুইচি বাগানের এককোনে একটা বেঞ্চিতে গুম হয়ে বসে আছে। ওর কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম। মনে হল এক

রাতেই ও একেবারে বুড়ী হয়ে গেছে। বললাম, কিরে! কাল সারারাত কেঁদেছিলি বুঝি?

ওর আত্মসম্মানে বোধ হয় ঘা লাগল। বললে, কাঁদতে যাব কিসের জন্য।

বললাম, তাহলে কিসের জন্য তোমার এই মলিন বেশ, এই রুক্ষ মনমরা চেহারা। তোমার বয়ফ্রেণ্ড কাল আসেনি বোধ হয়।

ও একটু ঝাঁঝালো গলায় বললে, আমার কোন বন্ধু নেই। যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে ফ্রেণ্ড হয় কি হিসেবে।

আমি সহানুভূতি দেখাবার জন্য বললাম, আহা মিলন না হতেই বিরহ।

ওর পাশে বসে পড়লাম। ও আমার একটা হাত বেশ শক্ত করে ধরল। তারপর ওর মনের দুঃখ আমার কাছে উজাড় করে দিল। বললে, কাল আমি ঠিক সময়েই পার্কে গিয়েছিলাম। আমরা দুজনেই তো শিক্ষিত তাই সামান্য একটু দেরী করার ভেতর কোন যুক্তি নেই। আমি অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছি কিন্তু ওর দেখা নেই। পনের মিনিট কেটে গেল, আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু ওর দেখা নেই। এক ঘণ্টা পরে আমি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম যেন ও সহজেই দেখতে পায় কিন্তু তবু ওর দেখা নেই। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক লোক যাওয়া-আসা করল, আমি বেশ একটু বিব্রতবোধ করলাম। শেষকালে একদল মস্তানের পাল্লায় পড়লাম। কি জঘন্য ব্যাপার বল তো!

বলতে বলতে জিয়া বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, বন্ধুর পথ একটু বন্ধুর হয়ে থাকে। তার জন্য দুঃখ করো না তাছাড়া এমনও তো হতে পারে কোন জরুরী কাজে কোথাও আটকা পড়ে গিয়েছিল।

ও প্রায় ক্ষেপে উঠল। বললে, না, না, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। ও একটা খেলা দেখাচ্ছে। ও বড় সাংঘাতিক ছেলে। বুকভরা অহংকার। প্রথম দিনেই আমি ওর কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলাম যে ওর মনে বেশ অহংকার আছে। কিন্তু কিসের জন্য এত অহংকার। মাসির কাছে ওর নামে নালিশ করতে হবে। ওর মতি গতি আমি কিছুদিন দেখব।

তারপর বেগতিক দেখলে আমিও কলা দেখিয়ে দেব। আচ্ছা, এইরকম-ভাবে হয়রান করবার কোন অর্থ হয়!

আমারও মনে হল ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি এইরকম খামখেয়ালী হয় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা জিয়া নিতে পারবে। জিয়ার আত্মসম্মান জ্ঞান বড় টনটনে। ন্যাকামী ও সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া মেয়েটা খুব জিদ্দি এবং একগুঁয়ে। স্কুলের পড়া শেষ হলে ওকে গ্রামে গিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছিল। শহর ছেড়ে গ্রামে ও কিছুতেই যাবে না।* ও সত্যি সত্যি গেল না। তার বদলে শহরেই জুতো বুরুশ করবার কাজ নিল। বাড়ী বাড়ী ঘুরে জুতো সেলাই করতো আর জুতো বুরুশ করতো। এই কাজের জন্য ওকে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে এবং কত না বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়েছে। অনেক জায়গায় অনেক ধাক্কাও খেতে হয়েছে। ফলে ও বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। কোথাও সামান্য বেয়াদপি এখন আর সহ্য করতে পারে না। তীক্ষ্ণ তীব্র ভাষাও ও অনেক শিখেছে। বাকযুদ্ধে ওর সঙ্গে সহজে কেউ পেরে উঠবে না। আমাদের ক্লাশের মোটা মেয়েটা যে ফট-ফট করে কথা বলে সেও ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না।

আমি জিয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, এত সহজেই ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। এই কলেজেই যখন আছে একটু খোঁজ নাও না।

—আমার বয়ে গেছে।

যাকগে ওর কথা। এবার নিজের কথায় আসি। আজকের ক্লাশ ছিল সমসাময়িক সাহিত্যের ওপর। আমাদের টিচার আমাদের পরীক্ষার জন্য বিষয় ঠিক করে দিলেন। 'হারিকেন' বইখানার ওপর বিস্তৃত গবেষণা-মূলক আলোচনা এবং সমালোচনা করতে হবে। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছামত এই আলোচনা করতে পারি।

* আমাদের দেশে বেকার কেউ থাকতে পারে না। স্কুলের পড়া শেষ হলেই ছেলে মেয়েদের তাদের শিক্ষা এবং যোগ্যতা অনুসারে কোন না কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়। উচ্চ শিক্ষারও সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তার জন্য একটা এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ঢুকতে হয়।

একটা কাজের মত কাজ বলতে হবে। ক্লাশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দলবেঁধে চললো লাইব্রেরীর দিকে। 'হারিকেন' বইখানার ওপর কে কি লিখেছেন ওদের সন্ধানী-দৃষ্টি সেই দিকে। আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে লাইব্রেরীতে গেলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম উপন্যাসখানা আমি আবার ভাল করে পড়ব এবং আমার নিজের মতামত আমার নিজের কথায় ব্যক্ত করব। নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী বিশদভাবে আলোচনা করব। তাই আমি সব কাজ ফেলে 'হারিকেন' বইখানা নিয়ে বসলাম।

পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সেই বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অন্যদিকে ঘন কালো জঙ্গল আর জলাভূমির আলেয়া, তার ওপর আকাশ রাঙা করে অপরূপ সূর্যোদয়। এইসব বিবরণ পড়তে পড়তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমার বয়স চোদ্দ কি পনের আর আমাকে ঠিক এইরকম পরিবেশে থাকতে হয়েছিল। কালচারাল রিভলিউশনের সময় আমার বাবার চাকরি গেল। কি কারণে চাকরি গেল তা কেউ জানে না। বাবাকে কোন এক জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর আমাকে উত্তর প্রদেশে মরুভূমি অঞ্চলে ফুল ফোটানোর জন্য পাঠানো হল। তখন আমরা গ্যাং অফ ফোর-এর নাম শুনিনি। তখন আমরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলাম। দেশের জন্য কাজ করছি, দেশটা উন্নত হবে এই কল্পনাই আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল। তাই ঊষর পরিবেশে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করেছি। মহা উৎসাহে রোজ বার-চোদ্দ ঘণ্টা কাজ করেছি, শীতে কষ্ট পেয়েছি, পেট ভরে খেতে না পেলেও আমাদের মনে কোন নালিশ ছিল না। সেই সব কথা মনে পড়ছে আর ভাবছি মূর্খের স্বর্গে বাস করা আর বাস্তব জীবন প্রত্যক্ষ করা এক কথা নয়। বাস্তব জীবনের কথা ভাবলেই মনটা বেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। হায় কালচারাল রিভলিউশন! হায় দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন!

৫

জিয়া গুইচির ব্যাপারে যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই হয়েছে। একটা ভুল ধারণা মনে পুষে ও মিছি মিছি কষ্ট পেয়েছে। খবরটা আমাদের কলেজের ক্যামপাস বুলেটিনে বের হল। কমপিউটার বিভাগের জনৈক ছাত্র, কিউ চিন, মস্তানদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জিয়া গুইচির বেশ খুশি খুশি ভাব। বুলেটিনটা আমাকে দেখিয়ে বললে, দেখেছিস কাণ্ড! সব জায়গায় বাহাদুরি দেখাতে যায়। পুলিশ এই মস্তানদের সঙ্গে পেরে উঠছে না আর উনি সেখানে গেছেন সর্দারী করতে।

গুইচি মেয়েটার মনটা বেশ ভাল। ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগেনি, তাই মেজাজটাও বেশ ঠাণ্ডা। বললে, আহা, আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে, একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত।

বললাম, আজই কলেজের পরে যাও না! সঙ্গে কিছু ফুল নিয়ে যেও।

জিয়া বললে, ভাই একা একা যেতে কেমন লাগছে। তুই-ও চল না আমার সঙ্গে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিয়ার সঙ্গে যেতে হল। যাবার সময় জিয়া কিছু কমলালেবু নিয়ে নিল।

কেন জানি না ওদের ব্যাপারে আমার মনেও বেশ একটু কৌতূহল জাগছিল। জিয়ার সঙ্গে হাসপাতালে গেলাম।

কিউ শুয়ে ছিল। কিউকে দেখে মনে হল ও এক গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে। ওর বা-কাঁধে ছোরা লেগেছিল। মাথায়ও বোধ হয় আঘাত পেয়েছে কারণ মাথায়ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মলিন মুখ, কিন্তু চাহনিতে বীরত্বের আভাস পাওয়া যায়। জিয়াকে দেখেই বলে উঠল, কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে!

কিউ ছুষ্টু হাসি হাসতে লাগল।

কমলালেবুগুলি লকারের মাথায় সাজিয়ে রাখতে রাখতে জিয়া বললে, এটা কি হাসবার ব্যাপার হল না কি ?

কিউ বললে, সেদিন তুমি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বসেছিলে। আমি যেতে পারিনি বলে সত্যি ছুঃখিত। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি এরকম কিন্তু আমার কখন হয় না।

জিয়া বললে, আগে ভাল হয়ে ওঠোতো, তারপর দেখা যাবে।

কিউ আমার দিকে চেয়ে মৃছু হাসল। নিছক সৌজন্য বলেই মনে হল। কিউকে দেখেই আমার কিন্তু খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। কিউও আবার আমার দিকে ভাল করে তাকাল। মনে হল ও-ও বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছে।

সে অনেক দিনের কথা। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন ওর নাম আমি জানতাম না। সেদিনও হঠাৎ দেখা হয়েছিল, আজও আবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

সে অনেক দিনের কথা। তখন ছিল কালচারাল রিভলিউশনের যুগ। সেই সময় আমাকে উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতে খামারে কাজ করবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দেশের জন্য কাজ করছি ভেবে আমি মহা উৎসাহে কাজ করতাম, ছুঃখ কষ্টকে ছুঃখ বলেই মনে করতাম না। তাই আমি কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিলাম। আর সুনজরে ছিলাম বলেই বছরে একবার বাড়ী যাবার জন্য ছুটি পেতাম। এইরকম ছুটি কাটিয়ে সেদিন আমি আবার উত্তর প্রদেশে ফিরে যাচ্ছিলাম।

ট্রেনে চেপে সেনিয়াং জংশনে পৌঁছলাম। এখানে গাড়ী বদল করতে হবে। স্টেশনে নেমেই শুনলাম এখানে পাঁচ ছ' ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তখন তো উৎসাহের সীমা ছিল না। তাই ভাবলাম, এই সুযোগে শহরটাকে একটু ঘুরে দেখে নিই। স্টেশনের বাইরে যাব এমন সময় তিনজন জোয়ান এসে আমায় ধরল। আমার হাতে ছিল একটা ব্যাগ। ব্যাগটা বেশ একটু বড়ই ছিল। তার ভেতর ছিল একগাদা বই।

তখন আমাদের বাড়ী ছিল অন্য জায়গায়। বাবা ছিলেন রেডগার্ডের কমাণ্ডার। তাকে তো কোন জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হল আর আমিও উত্তর প্রদেশে চলে গেলাম। বাড়ীটা তাই খালিই থাকতো। এবার ছুটিতে বাড়ী এসে দেখি খালি বাড়ী পেয়ে জোয়ানরা ভাল ভাল সব জিনিষ নিয়ে গেছে। বাবার এই বইগুলোই বাকী ছিল। তাই বইগুলো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম, নইলে এগুলোও লোপাট হয়ে যাবে।

জোয়ানরা তো আমাকে ধরল, এখন তল্লাসী করবে। ব্যাগের ভেতর কি আছে তা দেখবে। চেয়ে দেখলাম স্টেশনে সকলেরই মাল-পত্তর তল্লাসী করা হচ্ছে। আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। কারণ সেই সময় ইংরাজী বই রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

জোয়ানেরা ব্যাগটা খুলে ফেলল। ব্যাগের ভেতর থেকে একখানা বই বের হল, 'পিকউইক পেপারস'। একজন জোয়ান অপরজনকে জিজ্ঞেস করল, পিকউইক লোকটা কে ছিল বটে।

সে বইখানা ওর কাছ থেকে নিয়ে উলটে পালটে দেখে বললে, লোকটা এত কি লিখেছে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওদের কাজ দেখছিলাম। মনে মনে প্রমাদ গুণছিলাম। এইবার ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওদের দপ্তরে, বইগুলো সব বাজেয়াপ্ত হবে এবং আমার একটা কঠিন রাজনৈতিক শাস্তি হবে। মনে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় এক মস্তান মার্কা ছেলে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে জমাদার সাহেব ?

জোয়ানদের জমাদার বললে ওরা খুব খুশি হয়। জোয়ানরা বইখানা ছেলেটির হাতে দিয়ে বললে, এসব কি আছে ?

বইখানা হাতে নিয়ে ছেলেটা একবার আমার দিকে তাকাল, একবার জোয়ানদের দিকে তাকাল। আমার অবস্থাটা বোধ হয় অনুমান করতে পারল। বইখানা উলটে পালটে দেখে বেশ গম্ভীরভাবেই বললে, পিকউইক ! আঃ হাঃ, কমরেড পিকউইক ! আরে ইনি ছিলেন প্যারিস কমিউনের একজন মস্ত বড় নেতা।

জোয়ানরা বইখানা রেখে দিয়ে আর একখানা বই বার করল, আইনষ্টাইন। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আঃ হাঃ! কমরেড আইনষ্টাইন! ইনি ছিলেন কার্ল মাক্স-এর এক বিশেষ বন্ধু। আসলে ইনি ছিলেন এঙ্গেলস-এর মামাতো ভাই।

এর পরের বইখানা বের হল লাইফ অব কার্ল মাক্স।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখে সাহস করে বললাম, বাকী বইগুলো সব একই ধরনের। আমাদের কমিউনে রাজনীতি স্টাডি ক্লাশে এসব বই দরকার হয়।

যাক রেহাই পেয়ে গেলাম। জোয়ানরা আর একজন যাত্রীকে পাকড়াও করতে অন্য দিকে চলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মুখে লাগাতে বুঝতে পারলাম ভেতরে ভেতরে আমি বেশ ঘামিয়ে উঠেছিলাম। ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, বেবী, কেমন নাটক হল।

ছেলেটাকে প্রথম থেকেই আমি বেশ সন্দেহের চোখে দেখছিলাম। ভেবেছিলাম আমার অসহায় অবস্থা দেখে কোনরকম ফয়দা তুলবার আশায় এসেছে। ওর ব্যবহারে সে সন্দেহ অবশ্য রইল না, একটু কৃতজ্ঞতা বোধও জাগছিল। কিন্তু আমাকে বেবী বলাতে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। আমি রেগে বললাম, আমি বেবী নই। যাও তোমার সঙ্গে আমি আর একটা কথাও বলব না। তোমার সঙ্গে আড়ি।

এই বলে আমি তখনি ব্যাগটা কাঁধে তুলে দুম দুম করে ওয়েটিং রুমের দিকে চলে গেলাম। ওকে একটা ধন্যবাদও জানালাম না।

হাসপাতালে কিউর বেডের কাছে দাঁড়িয়ে এই ঘটনাটা ছবির মত মনের সামনে ভেসে উঠল। হঠাৎ কিউ বলে উঠল, এখানে এখন অন্যরকম নাটক।

বললাম, তাই তো দেখছি।

জিয়া শুইচি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

কিউ আবার জিজ্ঞেস করলে, সেই মামাতো ভাইটির খবর কি? তার তো এখন শতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে।

ওর দেখি সব কথা মনে আছে এবং আমাকে চিনতে পেরেছে। আমিও যে ওকে চিনতে পেরেছি তা জানাবার জন্য বললাম, কমরেড পিকউইকের খবর কি! কিন্তু তোমার দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি ডন কুইকসট হতে চলেছো।

জিয়া অবাক হয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

সাক্ষাৎকারের সময় পার হয়ে যাওয়াতে আমরা চলে এলাম। প্রথম সাক্ষাতে আমি ওর ওপর রেগে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয় সাক্ষাতেও ওর ওপর কোন উঁচু ধারণা হল না।

জিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ওকে চিনিস নাকি?

বললাম, অনেকদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল।

চলতে চলতে জিয়া বললে, ছেলেটা কিন্তু বেশ দাম্ভিক!

৬

অনেকদিন কিছু লিখিনি। লিখবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। আজো লিখে রাখবার মত তেমন কিছু নেই। তবে কদিন থেকে অনবরত বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ার একঘেয়ে সুর মনটাকেও উদাস করে তুলেছে। আজ উদাস মনের উদাস ভাবনা।

জিয়া এবং কিউ, দুজনের ভাব বেশ জমে উঠেছে। জিয়ার সেই লাজুক লাজুক ভাবটা আর নেই। চিকন কণ্ঠী জি-লাই সঙ্গীত চর্চায় মন দিয়েছে। কলেজের সব ফাংশানে এখন ওকে ডাকা হয়। এখন ও বাথরুমে গিয়েও গলা ছেড়ে গান করে। আমাদের ক্লাশের সেই মোটা মেয়েটা, মোটা গংগ প্রফেসর মা'র সঙ্গে বেশ একটু ভাব জমিয়ে নিয়েছে। প্রফেসর মা হলেন প্রাচীন চীনা সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তার সুনজরে পড়ায় মোটা গংগ পড়াশুনায় এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নাম করতে পারবে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সকলেই সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু আমার যে কি হয়েছে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মনটা যেন সবসময় একটা অজানা সংশয়ে ভরে থাকে। মন যেন শুধু বলতে থাকে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথাও অন্য কোনখানে।

সব কিছুর সব অস্তিত্বের একটা সঙ্গত কারণ আছে। এই যে আমি মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে উঠি তারও নিশ্চয় একটা সঙ্গত কারণ আছে। তাই ভাবছি সমস্ত জীবনটাই কি একটা লজিক, একটা কার্য-কারণে বাঁধা। এছাড়া কি আর কোন অর্থ নেই। আমি কি কোনদিন এর একটা অর্থ খুঁজে পাব না ?

৭

শনিবার বাড়ী এসে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হলাম। চিঠিটা খুলে বুঝতে পারলাম এটা একটা বেনামী চিঠি। চিঠিটা রেখে দিলাম।

পাই পিং চলে যাবার পর একলা ঘরে বসে চিঠিটা পড়লাম।

অপরিচিতাসু,

অপরিচিত একজনের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবে। কিন্তু তার আগে এই চিঠিখানা লিখবার জন্য আমি সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গত দুবছর ধরে কয়েকবার এই রকম একখানা চিঠি লিখবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে নিরস্ত করতে হয়েছে। কারণ আমার ধারণা ছিল যে এক পরমা সুন্দরী বিদুষী মহিলার কাছে এই রকম একখানা অযাচিত পত্র করুণার উদ্রেক না করে একটা অপ্রীতিকর চিন্তা, অন্যায় সন্দেহ এমন কি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। তা সত্ত্বেও আজ ভয়ে ভয়ে লিখছি। হয়ত তোমার কাছে হাস্যাস্পদই হব। আমার মনের বেদনা আমি আর চেপে রাখতে পারছি না।

দুবছর আগে প্রথম যেদিন তোমায় দেখি তুমি পথের ধারে কারো প্রতীক্ষায় হয়ত অপেক্ষা করছিলে। প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। আমার এই ভাল-লাগা কেমন করে তোমায় জানাব সেই ভাবনায় আমি বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছি। এই জানাতে না পারার বেদনা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

তুমি জান না, হয়ত টেরও পাওনি তোমাকে দেখবার জন্য আমি পথের ধারে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দাঁড়িয়ে থাকতাম যে-পথ দিয়ে তুমি তোমার ক্লাশে যেতে। একটু শুধু দেখার জন্য। আর যখনি তোমাকে দেখেছি তখনি শিরায় শিরায় এক দারুণ চাঞ্চল্য অনুভব করেছি। একবার তোমাকে আমি অতি কাছে দেখেছিলাম (লাইব্রেরীতে পড়ার টেবিলে) কিন্তু আমার হৃদ্‌স্পন্দন এত দ্রুত হয়ে উঠল যে আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। খাবার ঘরে যখনি গিয়েছি আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি সর্বাগ্রে তোমাকে খুঁজেছে, কিন্তু আমি সাহস করে তোমার দিকে চাইতে পারিনি। হায় ভীরু মন, হায় ভীরু ভালবাসা। তবু আমার চোখে তুমি অপূর্ব, তুমি রহস্যময়ী। আর মনে হয় তুমি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

আমার কথাগুলি প্রলাপ বলে মনে করতে পার, হেসে উড়িয়ে দিতে পার। সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু ভাল-লাগার, মুগ্ধ হবার অধিকার আমারও আছে। ভালবাসার স্বাধীনতা মানুষের একটা জন্মগত অধিকার। এতে সংশয় নেই, বঞ্চনা নেই, কিন্তু দুঃখ আছে প্রচুর। আমার ধ্যানচক্ষে তুমি সর্বদা বিরাজমান। তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন রচনা করে যাব। কিছু না করার চাইতে, কিছু না পাওয়ার চাইতে কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার ভেতর অনেক সান্ত্বনা আছে, অনেক বেদনাও আছে।

আমার মনে হয় আমরা কোনোদিন বন্ধু হতে পারব না। এক বছর পরে তুমি তোমার পথে চলে যাবে, আমিও হয়তো কোথায় হারিয়ে যাব, কে জানে। দেখা হবার বা দেখা পাবার আর অবকাশও থাকবে না। তুমি কিন্তু চিরকাল আমার অন্তরে ধ্যান হয়ে থাকবে। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

চিঠিখানা এখানেই শেষ।

চিঠিখানা পড়লাম। বেশ মজা লাগছিল। ছেলেটা কে হতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না। চিঠিটার ভেতর অনেক ভাল ভাল কথা আছে তবে উচ্ছ্বাসই বেশী। সব কথার ভেতর একটা কথা কিন্তু আমার মনে লাগল। কোন কিছু নিয়ে স্বপ্ন দেখা অনেক ভাল যদিও তার ভেতর প্রচুর বেদনা আছে।

চিঠিখানা পড়ে আমি পত্রলেখকের বেদনা ঠিকমত অনুভব করতে পারলাম না। কারণ সেই সঙ্গে আমার নিজের অন্তর্নিহিত বেদনাগুলি উদ্বেল হয়ে উঠছিল। কালচারাল রিভলিউশনের দিনে মরু প্রান্তরে সেই উৎসাহ, সেই স্বপ্ন দেখা আর এই নির্মম স্বপ্ন ভঙ্গ। আমি আমার নিজের মনকেই বুঝতে পারছি না, অন্যের মনকে কেমন করে বুঝবো। চিঠিখানা আর একবার পড়ে রেখে দিলাম।

৮

মনে মনে ঠিক করেছিলাম বেনামী চিঠিটা পাই পিংকে পড়তে দেব। ওতো ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে, ওর প্রতিক্রিয়া জানা যাবে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যে খুব গভীর তা নয়। তবে মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দিয়ে একটা সাড়া জাগাবার ইচ্ছাকে দমন করে রাখতে পারি না। শনিবার বাড়ী এসে তাই পাই পিং-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যার পরে পাই পিং এল। ওকে বললাম, আজ তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ রেখেছি।

ও বললে, সারপ্রাইজ! কি ধরনের সারপ্রাইজ!

—আগে বলো রাগ করবে না, তাহলে দেব।

—আচ্ছা, তোমার ওপর আমি কখনো রাগ করতে পারি?

এবার আমি বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা বের করে ওর হাতে দিলাম। বেশ একটা মুখভঙ্গী করে ও চিঠিখানা হাতে নিল, একটু বিস্মিতও হল বলে মনে হল। চিঠিখানা পড়তে পড়তে ওর মুখের চেহারা কি রকমভাবে বদলায় তা দেখবার জন্য আমি ওর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

পাই পিং চিঠিখানার ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে ওর কপাল কুঞ্চিত হল, মুখের পেশীগুলিরও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হতে লাগল। চিঠিখানা শেষ করে মাথা তুলে আমার দিকে চাইল। ওর চাহনিটা খুব অদ্ভুত লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাথাটা নিচু করে দ্বিতীয়বার চিঠিখানা পড়তে লাগল। মনে হল এবার লাইন বাই লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে।

আবার আর একবার পড়ল। ওর বিব্রত ভাব দেখে আমার বেশ মজা লাগছিল।

চিঠিখানা বার তিনেক পড়ে ও আমার মুখের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে আমাকে ভাল করে দেখতে লাগল। আমি ওর মনের অবস্থাটা আন্দাজ করে খুব সংযত হবার চেষ্টা করলাম। ও এতটা বিচলিত হবে ভাবতে পারিনি। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাসিটা সেরকম সহজ হল না। ও কি ভাবছে কে জানে!

পাই হঠাৎ টেবিলে একটা ঘুষি মেরে বলে উঠল, জঘন্য, রাবিশ। কলেজে এরকম ডেঁপো ছেলে আছে নাকি! যত সব অপদার্থ ছুঁচো!

ওর গলার স্বর বেশ কর্কশ বলে মনে হল। ও কিন্তু বেশ চালাক ছেলে। পরক্ষণে সুর পাল্টে বললে, অবশ্য এ চিঠির জন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ওর কথা শুনে মনে হল ও এতক্ষণ মনে মনে আমারই বিচার করছিল। ভাবছিল, এই চিঠিখানার জন্য আমিই প্রকৃত অপরাধী। তবে আমাকে দয়া করে রেহাই দিল। আমি বেশ একটু ক্ষুব্ধ হলাম।

কিছুক্ষণ পরেই পাই জিজ্ঞেস করল, একবার ভাল করে ভেবে দেখতো ছেলেটাকে তুমি চিনতে পার কিনা!

এর একটা সহজ সত্য জবাব আমি দিতে পারতাম যে, ছেলেটা কে তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু ইচ্ছে করেই সেরকম জবাব দিলাম না। আরো একটু মজা দেখবার জন্য চুপ করে রইলাম। একটু হাসবারও চেষ্টা করলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। বেশ তপ্ত গলায়ই বললে, শোনো লি, কয়েকদিন থেকে একটা কথা তোমাকে বলব বলব ভাবছি। তুমি আসলে বেশ সুন্দরী, সহজেই অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পার। তোমার তাই উচিত খুব সাধারণভাবে ড্রেস করা। সাজ-সজ্জার দিকে একেবারে নজর দেবে না।

পাই উত্তেজিত হয়ে যখন কথা বলে তখন ও একটু তোতলাতে থাকে, মুখ দিয়ে থুতুও ছিটকে বের হতে থাকে ; গলায় কথা হঠাৎ আটকে যায়, তারপর অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারে না। কথা বলতে বলতে পাই হঠাৎ আটকে গেল এবং তাতে আরো ক্ষেপে গেল। একটু দম নিয়ে আবার বললে, জান-ন-নই তো এ-এ-এক হাতে তা-তা-তালি বা-বা-বাজে না।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। বললাম তাহলে কি মাঝে মাঝে মুখে চুন কালি মেখে রাখব।

আমার অবাক চাহনি দেখে এবং আমার কথা শুনে ও সুরটাকে খুব নরম করে বললে, না, না, এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়, হেসে উড়িয়ে দেবার মত ঘটনা নয়। এসব খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে। তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে তুমি এখন কি করতে চাও ?

আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বললে, চিঠিটা তাহলে আমার কাছেই থাক। আমি তোমাদের কলেজের অধ্যক্ষের কাছে নিজেই যাব এবং চিঠিটা দিয়ে ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলব।

এই বলে ও চিঠিটা ভাঁজ করতে লাগল।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বলে উঠলাম, না, কক্ষনো এরকম করবে না।

এই বলে চিঠিটা ওর হাত থেকে একরকম ছিনিয়েই নিলাম। নিয়ে বললাম, তুমি এত নীচ! তোমার মন এত সংকীর্ণ!

রাগে ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। বললে, তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

এই বলে চিঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। সামান্য ধস্তাধ্বস্তি হল। আমি চিঠিটা শক্ত করে মুঠোর ভেতর ধরে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় ধপাস করে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে গেলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে আমাদের আবাসনের চোদ্দতল বাড়ীটার একেবারে ছাদে এসে পৌঁছলাম। ছাদে এসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। অপ্রীতিকর ভাবনাগুলো দূর করবার জন্য রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ালেম।

মাথার ওপর বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশ আর নীচে শহরের রাস্তা একটা সরু কালো ফিতের মত এদিক থেকে ওদিক চলে গেছে। গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহনগুলি গুবরে পোকার মত গুটি গুটি চলেছে আর বাড়ীর পর বাড়ী সাজানো রয়েছে, অনেক দূরে দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। বাতাস শুধু মাতামাতি করে চলেছে।

আমি চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম। তারপর এক সময় হাতের মুঠো বাতাসে খুলে দিলাম। চিঠির টুকরো-গুলো বাতাসে বাতাসে উড়ে গেল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাদা প্রজাপতির মত উড়তে উড়তে চললো তারপর অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল।

মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হল। মনটা একটু শান্ত হল। নীচে ঘরের ভেতর লোকটা বোধ হয় অস্থির চিত্তে বসে আছে। আমি বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। রাগটা ঠিক মত সামলাতে পারিনি।

সে যাই হোক, পাই পিং কিন্তু আসলে লোক ভাল। আমি যত লোকের সান্নিধ্যে এসেছি তাদের সবার চাইতে ওকে ভাল বলে মনে করি। ক্ষেত-খামারে কাজ করতে করতে আমার খুব অসুখ হয়েছিল।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। অসুখের জন্য আমাকে খামার ছাড়তে হল। সেই সময় একটা কারখানায় ওর অধীনে ওয়েল্ডারের কাজ পাই। তখন ওই আমাকে সাহায্য করেছে এবং নানা রকমভাবে রক্ষা করেছে। তখন সময়টা তো ভাল ছিল না। একটা অনিশ্চয়তার ভেতর আমাদের থাকতে হত। ওপরআলার কাছ থেকে কখন কার ঘাড়ে কি ধরনের খাড়া নেমে আসে তার ঠিক ছিল না। তাছাড়া কারখানার অন্যান্য কর্মীরাও কম যেত না। সব রকম বিপদ থেকে ও আমাকে রক্ষা করে চলতো। আমি সব সময় ওর কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। সেই জন্যই বোধ হয় ওর ধারণা হয়েছে যে আমার ওপর ওর একটা আধিপত্য জন্মেছে। আর এইরকম ধারণার জন্য আমার বাবাও খানিকটা দায়ী। পাই পিং একসময় বাবার অধীনে রেডগার্ডে ক্যাডেট ছিল। বাবা ওকে খুব স্নেহ করেন এবং এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তাই ও এখন থেকেই আধিপত্য জমাতে চায়। আমিও ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে চাই। তবে মাঝে মাঝে কি যেন হয়ে যায়। আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। আর আজ তো একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। ওর মন সংকীর্ণ আর কালচারাল রিভলিউশনের মানসিকতা ওর ভেতর এখনো রয়ে গেছে। আমাকে তাই আরো সাবধান হয়ে ওর সাথে চলতে হবে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখি পাই চলে গেছে। বাবা রেগে আছেন। আমাকে দেখেই ভর্ৎসনার সুরে বললেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার। কথার সঙ্গে কথা চালালে সব কথাই এক সময় শেষ হয়ে যায়। আর তুমি কি না ধপাস করে দরজাটা বন্ধ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলে! এ তোমার কি রকম আচরণ!

আমি অভিমানের সুরে বললাম, ওর কাছে তো আমি কেউই নই। ও শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ভয়ানক স্বার্থপর। আর তুমিও শুধু আমার দোষ দেখবে।

আমার কথা শুনে বাবা একটু নরম হলেন। সস্নেহে বললেন, অবুঝ হয়ো না। আসল কথা কি জানো, আমার মেয়ের মত একটি সুন্দরী

গার্লফ্রেণ্ড পেয়ে ওর মনে হয়ত ভয় হয়েছে অন্য কেউ হয়ত তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। এর নাম কি স্বার্থপরতা!

হাঃ হাঃ করে বাবা নিজেই খানিকটা হেসে নিলেন। বাবার হাসি দেখে বুঝলাম বাবার রাগটা তেমন গুরুতর নয়।

বাবা আবার বললেন, শোনো, তোমাদের ভেতর একটা ভুল বোঝা-বুঝি হয়েছে, একটু মনোমালিন্য হয়েছে। একদিন বসে সহজভাবে সব মিটিয়ে ফেলো।

আসলে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি কিছুই হয়নি। আসলে যা হয়েছে তা হল আমাদের দুজনের ভেতর ধীরে ধীরে একটা স্বচ্ছ কাচের প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠেছে। আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনুভব করতে পারছি না।

এই শনিবার পাই পিং আমাদের বাড়ী এল না। বুঝলাম আমার ওপর রাগ করেছে এবং ইচ্ছে করেই এল না। তবে এই ঘটনাটা বোধ হয় লিখে রাখবার মত কিছু নয়।

কিন্তু সোমবার আমাদের কলেজের ভিতরে ও বাইরে যেসব ঘটনাগুলি পরপর ঘটে গেল তা পুরোপুরি লিখে রাখবার মত। কারণ এরকম উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

দিনটা ছিল সুন্দর, আবহাওয়া চমৎকার। আর আমরাও বাড়ী থেকে এসেছি বেশ তাজা মন নিয়ে। একজন বলে উঠল, এমন রোদ্দুর ঝলমল দিন সচরাচর হয় না। আর একজন বলে উঠল, আজ সমুদ্রে গিয়ে সাঁতার কাটবার দিন। কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সাঁতারে উৎসাহ অনেকেরই। সবাই আনন্দে নেচে উঠল। আমাদের সাঁতার শিক্ষকও খুব উৎসাহ দেখালেন। সবার উৎসাহে নোটিশবোর্ডে নোটিশ পড়ল, আজ দুপুরের পরে আর কোন ক্লাস হবে না। বিকেলটা আমরা সমুদ্রের

ধারে কাটাব। সাঁতার শিক্ষকের নেতৃত্বে সকলেই সাঁতার দিতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

আমাদের সাঁতার শিক্ষক মিস্টার কুয়াঙ, গুয়াংডং প্রদেশের লোক। দেখতে একটু বেঁটে কিন্তু খুব ভাল লোক। কলেজের সুইমিং পুলে তিনি সকলকেই বেশ যত্ন সহকারে সাঁতার শেখান।

কলেজ জীবনে যে জিনিসটা আমার সব চেয়ে বেশী ভাল লাগত তা হল এই সাঁতার। কলেজ জীবনটা যে আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল তা কিন্তু নয়। আমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে এই কলেজে এসেছি। অনেকটা স্রোতের তৃণের মত ভেসে চলতে চলতে এখানে এসে আটকেছি। কিন্তু এখানেও যে সেরকম কোন বিশেষত্ব আছে সেরকম মনে হয় না। কথায় না বলে যে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে জল তাকে কি নতুনত্ব দেখাবে। কিন্তু সাঁতার জিনিসটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রায় দশ বছর আগে আমি একবার এক সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফ্রি স্টাইল সাঁতারে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলাম। সাঁতারের প্রতি আমার আগ্রহ বা অনুরাগ ঠিক তার জন্যও নয়। আসলে যখনি আমি জলে নামি, স্প্রিং বোর্ড থেকে লাফিয়ে পড়ি তখনি আমি অন্য রকম হয়ে যাই। মনের সব অবসাদ তখন দূর হয়ে যায়। সব নৈরাশ্য, সঞ্চিত সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। মুক্ত বিহঙ্গের মত বাধাবন্ধনহীন হয়ে আমি তখন অনন্ত আকাশের সঙ্গে যেন মিশে যাই। সে এক অপূর্ব অনুভূতি।

দল বেঁধে আমরা সমুদ্রের ধারে চলে এলাম। সমুদ্রের নীল জল ঢেউ-এর ওপর ঢেউ তুলে আমাদের যেন অভ্যর্থনা করল। আমাদের শিক্ষক আমাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, এরকম সুযোগ সহজে আর পাবে না। এখানে মনের আনন্দে সব রকম স্ট্রোক প্র্যাকটিশ করবার চেষ্টা করবে। আর সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে।

আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

মনের আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছি। সবাই কাছাকাছি। নানা রকম কায়দা দেখাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরেই আমরা

সবাই বেশ দূরে দূরে চলে গেলাম। তার পরেই খেয়াল হল আমার কাছাকাছি আর কেউ নেই। তবু আমি ফ্রি স্টাইলে সাঁতার কেটে চলেছি। দূরে তীরের রেখা ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল কোথাও যেন কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। কারণ যখনি আমি হাত পা ছেড়ে ভেসে থাকবার চেষ্টা করছি তখনি আমি যেন সমুদ্রের আরো গভীরে আপনা থেকেই চলে যাচ্ছি। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। একটু ভয়ও হল। আমি কি ভাটার টানে পড়েছি, ভাটার টানে ভেসে যাচ্ছি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম সমুদ্রের কালো-সবুজ আগাছাগুলি তীরের দিকে না গিয়ে সমুদ্রের ভেতরের দিকেই ভেসে যাচ্ছে। আমার পাশ দিয়েও কয়েকটি আগাছা নেচে নেচে চলে গেল। যা ভয় করছিলাম ঠিক তা-ই হয়েছে। আমি ভাটার টানে পড়েছি। বেশ বিপদে পড়েছি বুঝতে পারলাম। সমস্ত শরীর একটা অজানা আশংকায় শিউরে উঠল। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে তো চলবে না। আমাকে আরো দ্রুত সাঁতার কেটে তীরের দিকে যেতে হবে। কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা এক অসম্ভব ব্যাপার। এক পা এগোই তো বড় বড় ঢেউ এসে আমাকে তিন পা পেছনে ঠেলে দেয়। একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরক্ষণেই আবার খাদে পড়ে যাই। একটা সোলার মতই আমি ভাসছি, নাচছি, ডুবছি। করুণ নয়নে তীরের দিকে তাকালাম বুঝতে পারলাম আমার আর রক্ষা নাই। দম ফুরিয়ে গেলেই ব্যাস, অন্তঃস্রোতের টানে আমি সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুবে যাব। আকাশের সূর্যটাও কেমন ম্লান, ঠাণ্ডা, নির্দয় হয়ে চেয়ে রয়েছে।

আমি তীরের দিকে তাকালেম। দূরে একটা মসিরেখার মত দেখা গেল। সমুদ্রের বুকে সাধারণতঃ জেলেদের দুচারখানা নৌকা থাকে, দেখা যায়। কিন্তু আমার ধারে কাছে একখানা নৌকাও দেখলাম না। আমি একেবারে একেলা। যখন ঢেউয়ের তলায় যাচ্ছিলাম তখনই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এখান থেকে ফিরে যাবার শক্তি আমার আর নেই। আমার চেতনাও অর্ধলুপ্ত। আমি শুধু অভ্যাস মত হাত পা ছুঁড়ছিলাম ভেসে থাকার জন্য।

বাঁচবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। এরকম ঘটনা ডিটেকটিভ উপন্যাসে ঘটে থাকে। সিনেমায়ও মাঝে মাঝে এরকম ঘটনার সমাবেশ হয়। বাস্তব জীবনে এরকম ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। আমি ভাবছিলাম কতক্ষণ আর দম রাখতে পারব, হঠাৎ আমার কাছেই একটা কালো মাথা ভেসে উঠল। চিনতে পারলাম সে কিউ চিন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি। না, স্বপ্ন নয়, বাস্তব সত্য। আকাশের পাণ্ডুর সূর্য যেমন সত্য, ঢেউ-এর ওপর কিউ চিনও সেই রকম সত্য। কথায় বলে না সত্য ঘটনা উপন্যাসের কল্পনাকেও হার মানায়।

ঢেউ-এর ভেতর থেকে কিউ উঠল, সাঁতার কেটে আমার আরো একটু কাছে এল। হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝুলে পড়া চুলগুলি সরিয়ে নিল। কিউ এমন স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটছিল যে মনে হল ও কলেজের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে। আমার দিকে চেয়ে বললে, আরে ভয় পেয়ে গেছ নাকি! তুমি বেশ ঘাবড়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে।

দেখেছ কাণ্ড! এইরকম অবস্থায়ও ঠাট্টা-তামাসা করে।

আমি ততক্ষণে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছি। একটু সহজ সুরেই বললাম, এরকম অবস্থায় কি করা যায় বলতো।

কিউ জিজ্ঞেস করল, কিছুক্ষণ ভেসে থাকতে পারবে? দম রাখতে পারবে?

ওর মাথাটা জলের ওপর একবার উঠছিল, একবার ডুবছিল।

বললাম, পারব বোধ হয়। ঘণ্টাখানেক কোনরকমে ভেসে থাকতে চেষ্টা করব।

আমার আরো কাছে এগিয়ে এসে কিউ বললে, শোনো, আমরা এখন সমুদ্রতীর থেকে প্রায় তিন হাজার মিটার দূরে চলে এসেছি। এখন এই অবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা করা বৃথা। পারা যাবে না। তার চাইতে আমরা যদি আরো হাজার দুই মিটার এগিয়ে ভেতরের দিকে যাই তাহলে আমরা একটা ছোট দ্বীপ পাব। ভাল করে নজর করলে ঢেউ-এর তলায় দ্বীপটাকে দেখতে পাবে। আর সেখানে পৌঁছতে পারলেই আমরা

আপাতত নিরাপদ। এখন রেডী হও, আমার পিছন পিছন চলো।

ওর পরামর্শটা বেশ ভালই লাগল। আর সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না। স্রোতের টানে টানে মনে হল অনায়াসে ভেসে ভেসে যাচ্ছি। একবার একটা ঢেউ-এর মাথায় ওঠাতে দ্বীপটা নজরে পড়ল। পাহাড়ী জায়গা বলে মনে হল। পাহাড়ের একটা চূড়া দিনের আলোয় সোনার মত চকচক করছিল। ওইদিক লক্ষ্য করে আমি সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম।

দ্বীপটার যখন খুব কাছে এসে পড়েছি তখন কিউ বললে, একটু বাঁদিকে ঘেঁসে চলো। ওই পাহাড়টাতে গিয়েই উঠতে হবে। আর এটুকু যদি না পার তাহলে এইখানেই তোমার ইতি হয়ে যাবে।

এই বলে ও বলিষ্ঠ স্ট্রোকে এগিয়ে গেল।

একটা অজানা আশংকায় তখনো আমার বুক দুরু দুরু করছিল। আর এই লোকটা এইরকম সময়ও রসিকতা করতে ছাড়ে না। অদ্ভুত মানুষ! বাঁচবার জন্য এই যে সংগ্রাম এ-ও ওর কাছে একটা খেলা।

বাকী পথটুকু আমি সহজেই পার হলেম এবং দ্বীপটার তীরে এসে উঠলাম। নীল সমুদ্রে ঘেরা এই ছোট দ্বীপটি নতুন আশার সঞ্চার করল। আমি তীরে উঠে নরম বালির ওপর বসে পায়ে হাত বোলাতে লাগলাম। কিউ আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, আমরা এখন প্রায় পাঁচ হাজার মিটার দূরে আছি।

কিউর বয়স যখন পনের কি ষোল তখন থেকেই নাকি ও প্রতি বছর কয়েকবার ভাটার স্রোতে এই দ্বীপে আসতো এবং আবার জোয়ারের টানে ফিরে যেতো। কিউ আবার বললে, এই বছর এই আমি প্রথম এই দ্বীপে এলাম। আমি একটা লাল টুপি ভেসে ভেসে উঠছে দেখতে পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমার মত কেউ বোধ হয় ওই দ্বীপে চলেছে। তারপর দেখি লাল টুপি আর কেউ নয়, সে তুমি।

অদ্ভুত যোগাযোগ। অকূল সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই, জীবন-মরণ সমস্যা। এমন সময় ভুস করে সমুদ্রের

ভেতর থেকে একজন উঠে দাঁড়াল, বললে, এই পথে যাও, বেঁচে যাবে। অনেকটা ভোজবাজীর মত মনে হচ্ছে।

আমি একটা হাই তুললাম। নিজেকে বেশ অবসন্ন মনে হচ্ছিল।

কিউ বললে, এই যে বেঁচে গেলে, তুমি দেখছি একটুও অবাক হচ্ছ না।

অবাক হবারই কথা তবে ওকে তা জানতে দেব কেন। তাই একটু ম্লান হাসি হাসলাম এবং বললাম, দুর্যোগ কেটে গেছে আর তুমিও আমার অপরিচিত নও। সুতরাং অবাক হবার কি আছে!

ওর চোখে অবিশ্বাস। আমাকে বোঝাবার জন্য বললে, তোমার মত বয়সের মেয়েদের এরকম কথা বলা সাজে না। অবাক হবার ভেতর একটা তারুণ্য আছে। আমরা তাই এই পৃথিবীটাকে আবার নতুন করে, তরুণ করে দেখতে পাই। আচ্ছা একবার ভাবতো কেন, কেমন করে এবং কিসের জন্য তুমি এখানে এসে পড়লে?

ওর কথাতেই ওকে জবাব দিলাম, একটা নতুন, তরুণ পৃথিবীর সন্ধানে। আমাদের পুরোনো বৃদ্ধ হট্টগোলে ভরা পৃথিবী থেকে একটু দূরে যাবার জন্য।

ও চুপ করে গেল। মনে হল আর জবাব দিতে পারবে না। আমি স্মিত নয়নে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। তখন দিনের শেষ। সূর্য অস্তে যাচ্ছে। অস্ত রবির শেষ রশ্মি আভায় সমুদ্রের জল রক্ত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলাম।

কিউ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। হঠাৎ বলে উঠল, আমি কিন্তু কোন কিছু থেকে পালাবার চেষ্টা করছি না। আমার কাছে পৃথিবীটা তরুণ এবং সুন্দরই আছে। একটুও পুরোণো বা বুড়ো হয়ে যায়নি। আমার জন্মের সময় পৃথিবীটা যেরকম সুন্দর ছিল আজো ঠিক সেইরকম সুন্দরই আছে।

ওর কথার ভেতর একটা আন্তরিকতার আভাস পেলাম। মনে হল ও বেশ সুখী। সুখের পালংকেই হয়ত ওর জন্ম হয়েছে এবং এখনো বেশ সুখেই আছে। কালচারাল রিভলিউশনের বহ্নি বা অন্য কোনরকম দাগ পড়েনি ওর জীবনে। তুলনামূলকভাবে নিজের কথা ভেবে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। ম্লান মুখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে এল। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাতাস উঠল। ঠাণ্ডা কনকনে শীতের বাতাস। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। দ্বীপটাও নির্জন। কোনো লোকালয় নেই যে কোথাও একটু আশ্রয় পাব। আমার স্নানের পোষাক তখনো ঠিক মত শুকিয়ে উঠতে পারেনি। তার ওপর আবার একটু ক্ষুধার উদ্রেকও হয়েছে। ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায়, শীতে আমি বেশ কাবু হয়ে পড়লাম। সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। আশ্রয় নেব এরকম কোন কিছু এখানে পেলাম না। দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগল। আমি জড়সড় আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

আমার অবস্থা দেখে কিউ বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আরে তোমার ঠোঁট দুটি দেখছি নীল হয়ে উঠেছে। আবার আমাদের পাঁচ হাজার মিটার সাঁতার দিয়ে ফিরে যেতে হবে। পারবে তো ?

কাঁপা গলায় বললাম, পারব বোধ হয়। আমার এমন কিছুই হয়নি।

কিউ বললে, জোয়ার না এলে তো ফেরা যাবে না। জোয়ার আসতে এখনো কয়েক ঘণ্টা দেরী। ততক্ষণে তুমি তো ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে যাবে।

তারপর আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, তুমি যদি ছেলে হতে অথবা আমি যদি মেয়ে হতাম, তাহলে আমরা আমাদের দেহের তাপ দিয়ে পরস্পরকে গরম রাখতে পারতাম।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। কি বলতে চায় ও! দুঃসাহসে আমিও কম যাই না। ভাবলাম বলি, এখন কি লজ্জা করবার সময় ? কিন্তু বলতে পারলাম না।

একটা শুষ্ক হাসি হেসে কিউ অন্য দিকে ঘুরে ধোঁয়াটে তীরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল আত্মবিস্মৃত হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে বেশ শান্ত গলায় সুস্পষ্ট সুরে বলে উঠল, নাও, উঠে দাঁড়াও, একটু লাফালাফি কর, ওঠ-বোস করতে থাকো তাহলে শরীরটা বেশ গরম থাকবে। সময় হলে আমিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

এরপর সমাপ্তিটা বেশ সহজেই হল। যখন জোয়ার এল আমার অবস্থা তখনো শোচনীয়। আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দেব সেরকম শক্তি আমার ছিল না, সাহসও হল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় একটা লঞ্চের আলো দেখতে পাওয়া গেল। লঞ্চটা দ্বীপটার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। কিউ সাহায্যের জন্য চীৎকার করল। সে চীৎকার ওরা শুনতে পেল। তাই আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারলাম।

পরদিন সাঁতার শিক্ষকের কাছে খুব বকুনি খেলাম।

১০

নিজেকে খুব শক্ত বলে আমি মনে করতাম। কারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন ছিলাম। কিন্তু এবারের ধাক্কা আমি সামলাতে পারলাম না। তারপরের দিনই জ্বর এল এবং পরের দিন সোজা হাসপাতাল।

দুদিন ধরে প্রবল জ্বর চলেছে। ১০৪ এরও ওপর। ওরা আমার মাথায় বরফ চাপিয়েছে, ইনজেকশন দিয়েছে এবং আরো কত কি করেছে জ্বরের ঘোরে সব বুঝতে পারিনি। দু-তিন দিন থেকে হাসপাতালে আছি। এ কদিন কিভাবে কেটেছে জানতে পারিনি।

এখন রোগশয্যায় একা শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে ভাবছি। সে অনেক দিনের অনেক কথা। মনে হল আমি সেই উত্তর প্রদেশের তেপান্তরের মাঠে আমাদের খামারে আছি। আনন্দ আর বেদনায় জড়ানো সেই সব দিনগুলি মনের পরদায় ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সে কত বছর আগেকার কথা তবু যখন একান্ত একা হয়ে পড়ি, সেই সব বেদনা মিশ্রিত দিনগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে অস্তরবির শেষ রশ্মিগুলি তেরছাভাবে ঘরে আসছে। তার আভায় দেয়ালটা রঙীন হয়ে

উঠেছে। অতীতকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। ওসব দিনের কথা আর ভাবব না। আর ভেবে ভেবে নিজেকে অসহনীয় করে তুলব না।

এখন ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে। কাল আবার শনিবার। কাল যদি হাসপাতাল থেকে ছুটি না পাই তাহলে আবার একটা গোলমেলে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

১১

ভেবেছিলাম আমার অসুখের খবর কেউ জানতে পারবে না। কেউ মানে আমার বাবা ও পাই পিং। বাবা বোধ হয় জেনেছেন, তবে কোন গুরুত্ব দেননি। পাই পিং নিশ্চয়ই জানতে পারেনি। বোর্ডিং-এর মেয়েরা তো জানে। ওরা আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেও গেছে। কিন্তু শনিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি না পাওয়ায় পাই পিংও জেনে গেল।

রবিবারে তাই দেখলাম তার চিরসাথী সেই পুরোনো ব্রীফকেসটা নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে পাই পিং এসে ঘরে ঢুকল। বুঝতে পারলাম কারখানা থেকে সোজা এখানে এসেছে। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে একটা ম্লান হাসি হেসে বললে, বেশ রোগা হয়ে গেছ দেখছি।

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, ও কিছু নয়, বসো।

ও বসলো এবং ওর অভিযোগ শুরু হল। বললে, আচ্ছা, তুমি কেমন ধারা মেয়ে বলতো? আমাকে একটা খবরও দিলে না, তোমার বাবাকেও জানালে না।

আমি সহজভাবেই বললাম, খবর দেব কেমন করে। রাতে শুয়ে পড়লাম তারপর কখন যে হাসপাতালে এলাম নিজেই জানি না। সে যাই হোক, খবর কখনো চাপা থাকে না। তোমরা তো জেনে ফেলেছো।

হাতের বুড়ো আঙুলটা নিজের বুকের দিকে দেখিয়ে পাই বললে, হুঁহুঁ, এ শর্মার কাছে তোমার কোন কিছুই গোপন থাকে না।

আমি সহজ হবার চেষ্টা করছিলাম। ওর কথা শুনে মনে মনে হাসলাম। খবর তো কত রাখো! শনিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলে এই অসুখের কথাও জানতে পারতে না। মুখে বললাম, কে তোমাকে এই খবর দিল?

—তা জেনে কি হবে, এই বলে ও বেশ একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল।

তারপর সুরটা খুব নরম করে বললে, তুমি কি এখনো আমার ওপর রাগ করে আছ। সেই জন্যই কি তুমি তোমাদের সাঁতারে যাবার কথা আমাকে জানতেও দাওনি?

সেদিনকার কথা মনে পড়ল। আমার আচরণ সেদিন একটু অসংযত এবং অশালীন হয়েছিল। তাই বললাম, রাগ তো তুমি করেছ।

—তোমার ওপর আমি রাগ করব এটা তুমি ভাবতে পারলে! না, না, আমি বুঝতে পারছি সেদিন আমার আরো সংযত হওয়া উচিত ছিল।

সেদিনের সেই বেনামী চিঠির কথা মনে পড়ল, পরের ঘটনাগুলিও মনে পড়তে লাগল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে পাই আবার বললে, সত্যি, আমি খুবই অন্যায় করে ফেলেছিলাম। তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা আবার আগের মত হয়ে যাব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই বলে পাই তার ব্রীফকেসটা খুলে একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ, এক প্যাকেট বিস্কিট, এক শিশি মিল্কশেক এবং গোটা কয়েক কমলালেবু বার করে লকারের ওপর রাখল। এইগুলো সাজিয়ে রেখে প্রসন্নচিত্তে আবার একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

আমি ভাবছিলাম এত প্রসন্নতা কেন! মোয়া দিয়ে ছোট মেয়েটিকে ভোলাতে চায়, না মনে মনে ভেবে নিয়েছে আমিই আমার সব দোষ বুঝতে পেরে মেনে নিয়েছি। না, এইগুলো হল তার আন্তরিকতার নিদর্শন। ওরই সঙ্গে তো আমার বিয়ে হবার কথা, অন্ততঃ বাবার সেইরকম ইচ্ছা। কলেজ থেকে ডিগ্রী পেতে আর মোটে একটা বছর। তারপরে ও যেমনটি চায় আমাকে সেইভাবেই জীবন যাপন করতে হবে। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম থাকবে না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলেই মনটা বেশ দমে যায়। লোকটা যে খুব খারাপ তা নয়। আমি মাঝে মাঝে ওর বিরুদ্ধে অনেক

কিছু ভাবি। তবে আমার ভাবনাগুলো খুবই এলোমেলো। ওর অনেক ভাল দিকও আছে। দয়া মায়া স্নেহ মমতা ওর শরীরে অনেক আছে। আমাকে বহুদিন ও নানারকম বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। এখনো আমার জন্য বিশেষ চিন্তা করে। তার নিদর্শন তো ওই লকারের ওপরই আছে। তাছাড়া আমার অসুখের কথা শুনেই তো ছুটে এসেছে। এখনো ওর কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ লেগে রয়েছে।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। জিয়া গুইচি এবং কিউ চিন ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই জিয়ার নজর পড়ল লকারের ওপর। লকারের ওপর ওই সব দেখে জিয়া মহা উল্লাসে বলে উঠল, লি, সত্যি তুই খুব লাকি গার্ল।

পাই পিং একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। ঠাট্টা করে জিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি সেই লোক যার সঙ্গে তোমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি।

জিয়া হাসল। জিয়ার সেই আড়ষ্ট ভাবটা চলে গেছে। এখন সে ঠাট্টা তামাসায় সমানভাবে যোগ দেয়। সে আমার দিকে চেয়ে পাই পিং-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিল। তারপর কিউর দিকে তাকাল। দুজনকে মনে মনে বোধ হয় তুলনা করে নিল। তারপর লকারের ওপর রাখা জিনিসগুলি দেখিয়ে কিউকে বললে, তুমিও এইরকম করবে নাকি!

কিউ মৃদু হাসল। আমাকে বললে, একদিন তুমিও সত্যি অবাক হয়ে যাবে।

আমিও হেসে জবাব দিলাম, এত সহজে আমি অবাক হই না।

অবাক হবার রেফারেন্সটা ওরা কেউ জানে না। তাই আমাদের কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে পাই ও জিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমার বেশ মজা লাগল। এই একটা বিষয় যার সম্বন্ধে পাই পিং কিছুই জানে না। জিয়া এবং কিউর আগমনে ও বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। এখন হয়ত ভাবল ওকে বাদ দিয়েই আমরা আলাপ জমাচ্ছি।

বেশ একটা থমথমে ভাব এসে গেল। কেউ মন খুলে কোন কথা বলতে পারছে না।

জিয়া গুইচি এখন বেশ চালাক মেয়ে হয়ে উঠেছে। অন্য কিছু করতে বা বলতে না পেরে ও আমার বালিশের তলা থেকে একটা সিনেমা পত্রিকা টেনে বার করল। আমার অলস সময় কাটাবার জন্যে আমি পত্রিকাটা একজন নার্সের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। জিয়া পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা জাপানী ছবির ওপর দু-চারটে কথা বলে ঘরের এই থমথমে ভাবটা ভাঙবার চেষ্টা করল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে।

ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডকে অবহেলা করে অন্য একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে বসল। জিয়া মেয়েটির নিন্দা করে বললে, এর আর এক নাম বিশ্বাসঘাতকতা।

পাইও জিয়ার সঙ্গে একমত হল।

কিউ বলে উঠল, ছেলেটিরও তো দোষ থাকতে পারে।

পাই আপত্তি করে বললে, ছেলেরা কখনো ওরকম করে না।

আমি পাই-এর দিকে চেয়ে বললাম, ছেলেদেরও সবসময় বিশ্বাস করা যায় না।

জিয়া ও কিউ দুজনেই হেসে উঠল।

পাই রাগ দেখিয়ে বললে, আসলে তোমরা কি বলতে চাও?

কিউ বলে উঠল, প্রেম বা ভালবাসার প্রকৃত অর্থ কি?

আলোচনা বেশ জমে উঠল।

—প্রেম! ভালবাসা! —জিয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু না বলে চুপ করে গেল।

পাই বললে, ভালবাসার সঙ্গে কিছু দায়িত্ব এসে যায়। একটা দায়িত্বকে ঘিরে ভালবাসা প্রকাশ পায়।

কিউ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, সে দায়িত্বগুলি কি প্রকারের জানতে পারি কি?

কথা কাটাকাটি না ঝগড়ার পূর্বাভাস। ওদের নিরস্ত করবার জন্য আমি বললাম, দায়িত্ব আসলে কিছু নয়, একে কর্তব্য বলতে পার। মেয়ে

যাকে বিয়ে করবে, বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে তার কতকগুলি সাংসারিক কর্তব্য এসে যায় এবং সেই সঙ্গে ছেলের ঘাড়েও অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপে। দুজনেরই একটা নিষ্ঠা থাকা দরকার।

পাই আমার দিকে আড় চোখে তাকাল। আমার কথাটা বোধ হয় ওর মনঃপুত হল না। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি এ বিষয়ে আরো কিছু বলতে চাও?

পাই চুপ করে রইল।

কিউ বললে, তোমাদের বলা যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে আমি কিছু বলি।

এই বলে কিউ আসর জমিয়ে বসল। প্রথমেই শুরু করল, তোমরা যেসব কর্তব্য এবং দায়িত্বের কথা বলছো, ওসব হল মধ্যযুগীয় ধারণা। কৃষিভিত্তিক সমাজ কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই সমাজ জীবনে একটা স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনে সমাজ রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। রক্ষণশীল সমাজে নানারকম বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার সে-রকম প্রয়োজন কেউ বোধও করে না। প্রেমঘটিত বিবাহ সে যুগে কল্পনার বাইরে ছিল। ছেলে মেয়েদের বিবাহ অবশ্যই হত তবে সেখানে ভালবাসার কোন স্থান ছিল না। ভালবাসা বিয়ের পর জন্মাত একত্রে বসবাস করবার জন্য।

তারপর শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো আস্তে আস্তে বদলাতে লাগল। সমাজ জীবনেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হল। গ্রামের জীবন শহরমুখী হল, শহর থেকে বহুমুখী। রক্ষণশীলতা শিথিল হতে লাগল, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রশ্রয় পেতে লাগল এবং তার প্রভাব প্রেম, ভালবাসা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও পড়তে লাগল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। তাই প্রেম, ভালবাসা এবং বিবাহে স্বাধীনতাকে এক হিসেবে বুর্জোয়া মানসিকতা বলা যেতে পারে। কিন্তু তখনো মেয়েদের অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে যায় তাই এই স্বাধীনতা ভোগ করে ছেলেরাই বেশী। জাপানে এখনো বুর্জোয়া সমাজ তাই সকলে মেয়েটির

দোষ দেখবে, নিন্দা করবে। ছেলেটির দোষ দেখবে না, ছেলেটির মনো-বেদনায় সহানুভূতি জানাবে।

জিয়া গুইচি বেশ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছিল। তাই বলে উঠল, তাহলে তুমি বলতে চাও এই যে আমরা জাপানী মেয়েটির নিন্দা করলাম, এটা আমাদের বুর্জোয়া মানসিকতা।

কিউ একটু হেসে বললে, হতে পারে।

পাই পিং-এর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম ও খুব বিরক্তি বোধ করছে। আমি তাই বললাম, এসব তত্ত্ব কথা এখন থাক। আমাদের সমাজে ভালবাসার চেহারা কিরকম হবে সে সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিতে পার।

কিউ হেসে বললে, আসলে ভালোবাসার কোন চেহারা নেই। এটা একটা অনুভূতি এবং একান্ত নিজস্ব। তবে বিবাহ জিনিসটা সামাজিক ব্যাপার। ভালবাসার স্থান সেখানেও আছে। তবে যেটা প্রয়োজন তা হল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং আত্মসচেতনতা। আমাদের দেশে তো অর্থ-নৈতিক দাসত্ব নেই। মেয়েরাও ছেলেদের মত সমান স্বাধীন। সুতরাং সামাজিক মিলন হবে সমানে সমানে। সমান স্বাধীনতা এবং সমান আত্মসম্মান এই দুটি হবে মিলনের ভিত্তি।

আলোচনা, মানে কিউর বক্তৃতা আরো কিছুক্ষণ হয়ত চলতো। নার্স এসে দরজায় উঁকি মেরে বলে গেল, সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হয়ে গেছে।

ওরা উঠে দু-চার কথা বলে এক এক করে চলে গেল। আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। কিউ বেশ অদ্ভুত মানুষ। আজ সে একজন বেশ জ্ঞানী লোকের মত কথা বলেছে। অনেক জ্ঞানের কথা ও আমাদের শুনিয়েছে।

একটু পরে কিউ আবার একা ফিরে এল। কি যেন ফেলে গিয়েছিল সেইটে নিতে এল। এখন সে একেবারে অন্য লোক। মুখে মৃদু হাসি। সেই গম্ভীর ভাবটা আর নেই। বক্তৃতা দিয়ে বোধ হয় খুব তৃপ্তি পেয়েছে অথবা মন এখনো সংশয়ে ভরা। ওকে বোঝা মুস্কিল।

একটু মজা করবার জন্য বললাম, এই যে বক্তা মশায়, তুমি তো বেশ বক্তৃতা করতে পার।

জিনিসটা নিয়ে তখনি চলে না গিয়ে ও একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর বেশ কায়দা করে বললে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, তবে তুমি তর্ক করে আমাকে ঠকাতে পারবে না।

আমিও বললাম, তোমার চিন্তাধারা একটা কাল্পনিক সরল রেখার মত, তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—না, না, তা কেন হবে। জীবনটা কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য।

আমিও দমবার পাত্রী নই। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বক্তা মশায় নিজের জীবনেও কি এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেন?

আমি বিজয় গর্বে ওর মুখের দিকে তাকালেম। চোখে চোখ পড়তে ও একটু বিব্রত বোধ করল। চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে মনে হাসলাম। দেখি তোমার গর্ব কোথায় থাকে।

কিউ তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। বললে, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এইসব গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আপাততঃ স্থগিত রইল।

এই বলে কিউ উঠে চলে গেল।

১২

আরো কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর ও মন তাজা করে কলেজের বোর্ডিং-এ ফিরে এলাম। ফিরে আসার দুদিন পরেই আবার একটা বিপদে পড়লাম। ঠিক পড়লাম বলা যায় না, একটা বিপদ ডেকে আনলাম।

সেদিন সকালে অধ্যাপক কিং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যের ওপর একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তিনি এই বিষয়ে সুপণ্ডিত। ইউরোপের কয়েকজন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে তুলনা-মূলকভাবে আলোচনা করলেন। ক্লাশ যখন শেষ হয় হয় তখন তিনি কবি পেটোফি'র ফ্রিডম এণ্ড লাভ (প্রেম ও স্বাধীনতা) এই কবিতাটি মৃদু সুরে আস্তে আস্তে আবৃত্তি করলেন। আমরা তন্ময় হয়ে সে আবৃত্তি শুনলাম। অধ্যাপক কিং-এর গলা বেশ মিষ্টি। আবৃত্তি শেষ হলে তিনি তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি কেউ ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে এই কবিতার ভেতর বুর্জোয়া প্রভাব কেমন করে প্রকাশ পেয়েছে ?

এরকম একটা প্রশ্ন করে বসবেন আমরা কেউই আশা করতে পারিনি। ক্লাশের ভেতর বেশ একটা গুঞ্জন উঠল। প্রফেসর কিং চোখ থেকে চশমাজোড়া খুললেন, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে, মনে হল জিয়া গুইচিকেই লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি কিছু বলবে ?

জিয়া গুইচি বেশ ভাল মেয়ে। ক্লাশে খুব চট-পট কথা বলে, কথার উত্তর দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলতে পারল না। একেবারে বোবা হয়ে বসে রইল। কিছু বলতে না পারার লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। পাশেই আমি বসেছিলাম। ওকে ফিসফিস করে বললাম, কিরে, তোর কি হয়েছে ! তাহলে আমি কিছু বলি।

ও যেন বেঁচে গেল। বললে, তুই-ই বল ভাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্লাশের সকলের নজর আমার ওপর পড়ল। অধ্যাপক কিংও আমার দিকে চেয়ে আমাকে বলতে উৎসাহ দিলেন।

আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এসে গেল। একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। ঠাট্টা করে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ইচ্ছায় একটু কেশে গলা সাফ করে বলতে আরম্ভ করলাম। বললাম, প্রথমেই বলা ভাল যে কবি স্বয়ং বুর্জোয়া বংশোদ্ভূত, তবে তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুতর কথা হল এই যে এই

কবিতায় সাম্যবাদই যে জীবনের আদর্শ তা বলা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এই কবিতায় মেহনতি মানুষদের সুখ-দুঃখের কোন উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ এই কবিতায় বলা হয়েছে প্রেমের স্থান রাজনীতির উপরে এমনকি সমাজ জীবনেরও উপরে। চতুর্থতঃ··· ··· ···

আমার কথা শেষ হবার আগেই সমস্ত ক্লাশে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সেই হাসির গুঞ্জন শেষ হতে না হতেই ঘণ্টা পড়ে গেল। অধ্যাপক কিং তাড়াতাড়ি চশমাজোড়া পকেটে পুরে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ এ কি করে বসলাম, কেন করলাম নিজেই বুঝতে পারলাম না। এরকম কোন পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল না। এর যে কি পরিণাম হবে বা হতে পারে তা-ও ভেবে দেখিনি। মনের ভেতর বোধ হয় কোন একটা অশান্ত শক্তি বা অতৃপ্ত ইচ্ছা ঘুমিয়ে আছে যা মাঝে মাঝে হঠাৎ চমক দিয়ে যায়। কেন এরকম হয় ঠিক বুঝতে পারি না।

এমনি করেই আমি আমার নিজের বিপদ ডেকে আনি। অপরাধ যখন করেই ফেলেছি তখন শাস্তি ভোগও করতে হবে। ক্লাশ শেষ হয়ে গেলে মোটা গংগ আমার কানে কানে বলে গেল, তুমি কি জানো তোমার বাবা একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে বসেছিলেন।

বাবা মাঝে মাঝে এরকম গোয়েন্দাগিরি করেন। তবে কাউকে কিছু বলেন না। এবার বোধ হয় আমাকে নিয়ে পড়বেন। গংগ-এর কথা শুনে মনটা বেশ দমে গেল।

ক্লাশের শেষে বিকেলের দিকে আমি মাঝে মাঝে সুইমিং পুলে যাই। বিশেষত মনটা যেদিন ভারী হয়ে থাকে। সুইমিং পুলে কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়ে মনের বোঝা হাল্কা করবার চেষ্টা করি। সেদিনও বিকেলবেলা সুইমিং পুলের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমার হাত ধরে কৃত্রিম পাহাড়টার কাছে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। বললেন, গুরুতর বিষয় নিয়ে তুমি এত সুন্দর তামাসা করতে পার আগে তো জানতাম না।

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা তাহলে সেরকম রাগ করেননি। একটা কাঠি দিয়ে দেয়ালের শেওলা খুঁটতে খুঁটতে একটা মৃদু ভর্ৎসনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

—এরকম করলে কেন বলতো ?

তাহলে ঠিক ভর্ৎসনা নয়। তিনি বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

আমি আদুরে মেয়ের মত বললাম, কেন অধ্যাপক কিং তো তাঁর প্রশ্নের জবাব কাউকে দিতে বলেছেন।

—বাজে কথা বলো না। এবার বাবার গলার স্বরটা একটু কড়া—সব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা তামাসা চলে না, বুঝলে ? আসলে ওই ধরনের প্রশ্নটাই তোমার ভাল লাগেনি। ঠিক তাই। আর ভাল লাগেনি বলেই তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে চরমে চলে গেছ। তোমার মত বয়সের সকলেরই দেখছি মাত্রাজ্ঞান থাকে না। তোমাদের কি হয়েছে বলতো। তুমি তো এরকম ছিলে না। গ্যাংগ অফ ফোরের সময় তুমি তো সবকিছুর ভেতর বুর্জোয়া গন্ধ পেতে। আর এখন তুমি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা সহ্য করতে পার না। কিন্তু ভুলে যেও না তুমিও এই দেশেরই মেয়ে।

আমার হাতে একটা সবুজ পাতা ছিল। সেটা দু'টুকরো হয়ে গেল। আমি নীরবে শেওলা খোঁচাতে লাগলাম। মানুষের জন্মের অনেক অনেক বছর আগে এই শেওলাগুলোর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু আজ এরা নগণ্য। মানুষই প্রভুত্ব করে। আমার মন তখন অন্য কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বাবা বললেন, যাও, এখনি সময় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নাও। অধ্যাপক কিং বোধ হয় এখনো কলেজেই আছেন। সব সময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাজ করবে। আর এরকমভাবে আমাকে বিব্রত করবে না।

এই বলে বাবা অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আর চলতে চলতে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, তুমি তো বেশ অভিনয় করতে পার। তোমাদের

ড্রামা ক্লাবে যোগ দাও না কেন ? কয়েক মাসের মধ্যে তো এখানে একটা নাটকের উৎসব হবে। এই শহরের সমস্ত কলেজ ও ইউনিভার্সিটি তাতে যোগ দেবে।

বলতে বলতে বাবা চলে গেলেন।

বাবার দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি একটু খুঁড়িয়ে চলেন। একসময় ক্যান্টেনরীতে ছিলেন। পা খোঁড়া হয় সেই সময়েই। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার কোন কাজের জন্য আমার বাবা অসুবিধায় পড়বেন কেন ? বাবার মেয়ে সেইজন্য তার মনে একটু দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য তো তাঁর কর্মক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। আমি তো কলেজে এসেছি নিজের ক্ষমতায়। রীতিমত এনট্রান্স পাশ করে। বাবা কলেজে আছেন সে সুযোগ নেবার তো দরকার হয়নি। তাছাড়া যখন আমি পরীক্ষার জন্য বসি বাবা তখন এই কলেজেই ছিলেন না। অনেক পরে তিনি বদলি হয়ে এই কলেজে আসেন। তাহলে তিনি আমার কোন কাজের জন্য বিব্রত বোধ করবেন কেন ? মর্যাদা হানি হবে এরকম তিনি মনে করবেন কেন ? গত কয়েক বছর ধরে নিজের সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিয়েছি, কারো সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ করিনি, দরকার মনে করিনি। ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও হয়েছে। আমি যেসব দেখেছি, যেসব শুনেছি, যেসব ভুগেছি তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আমি এখন বড় হয়ে গেছি, লম্বায় বোধ হয় বাবার সমান হব, কিন্তু তিনি বোধ হয় ভাবতেও পারেন না যে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি এখন তাঁর চাইতেও গভীর-ভাবে চিন্তা করতে পারে। মাঝে মাঝে মনে হয় বাবা বোধ হয় চান না যে আমি স্বাধীনভাবে বড় হয়ে উঠি। অথবা এমনও হতে পারে আমি যেন সর্বদা তাঁর মতে এবং তাঁর পথে চলতে অভ্যাস করি। তাহলে তিনি হয়ত বেশ শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবেন।

সেদিন আমি নিজেকে বড়ই দুর্বল এবং অসহায় মনে করেছিলাম। বোধ হয় অন্যায় কিছু করে ফেলেছি। বাবা কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারেন না, বুঝতে হয়ত চানও না। আমি নিজেও বুঝতে পারি না

কি অন্যায় করে ফেলেছি। আমার নিজের মনকেও আমি বোঝাতে পারছি না।

সুইমিং পুলে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম। তারপর উঠে আমার ভেজা চুলে একটা হাল্কা গেরো দিয়ে কাপড় বদলাবার ঘরে গিয়ে আয়নাটার সামনে দাঁড়ালাম। আয়নায় দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোল গলা, কালো ভুরু, ভুরুর নীচে লম্বা নাক, পাতলা ঠোঁট, মেয়েটিকে সুন্দরী বলা চলে। তবে দুষ্টুমি ভরা চাহনি, ছেলেমানুষের মত সরল তবে বেশ একটা গর্বিত উদ্ধত ভাব আছে। এই কি আমি!

সুইমিং পুল থেকে আমাদের ডরমিটরে যাবার একটা সোজা পথ ধরলাম বড় বড় সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে। বুনো গাছে ফুল ফুটেছে। তারই বুনো গন্ধে বাতাস ভরে আছে। দালান-কোঠা আর হট্টগোলের ভেতর বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে মুক্ত বায়ুর কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি চোখ বুঁজে এই মিষ্টি বুনো গন্ধে ভরা মুক্ত বায়ু সেবন করতে করতে আনমনে চলেছিলাম। আমি যখন একা থাকি তখন নিজেকে সহজ এবং হাল্কা করে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুভব করি, বেশ ভাল লাগে। মন আমার কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এরকম অবস্থায় কবির ভাষায় বলা যেতে পারে নিজেরে হারায়ে খুঁজি। প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যাই ঠিকই তবে খোঁজাটা বোধ হয় আর হয় না। এরকম অবস্থায় বাবা যদি আমাকে দেখে ফেলেন, তাহলে হয়ত ভাববেন, খুদে বুর্জোয়ার আত্মসমীক্ষা হচ্ছে। আর পাই পিং তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করবে যে জনসমুদ্রে বাস করাই যথেষ্ট নয়, তাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। পাইকে দোষ দেওয়া যায় না। সে একজন নীরেট পণ্ডিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সে উপভোগ করতে পারে না। আর সে চায় সকলেই যেন তার মত হয়। আর বাবা তো আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। আমি জানি বাবার ছোটবেলাটা খুব কষ্টের ভেতর দিয়ে কেটেছে, বহুদূরে একটা পাহাড়ী অঞ্চলে। তাই কলেজ বা ইউনিভারসিটিতে ঢুকবার সুযোগ পাননি। তবে এভাবে পাই পিংকে বা বাবাকে বিচার করা বোধ হয় অযৌক্তিক এবং অন্যায় হচ্ছে। আসলে

আমরা সকলেই একটা মস্ত বড় সামাজিক যন্ত্রের এক একটা অংশ মাত্র।

ভাবতে ভাবতে আমি চোখ বুঁজেই কচি কচি ঘাসের ওপর দিয়ে চলছিলাম। কোন দিকে যাচ্ছি খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা সুরেলা আওয়াজ কানে এল। কেউ যেন সুর করে একটা কবিতা আবৃত্তি করছে; এক অন্ধ মানুষ এক অন্ধ ঘোড়ায় চড়ে রাতদুপুরের অন্ধকারে এক অন্ধ জলাশয়ের ধারে এল।

চোখ মেলে চেয়ে দেখি কিউ চিন কৃত্রিম পাহাড়টা থেকে জলে ঝাঁপ দিল। কি আশ্চর্য, আবার কিউ চিন! এবার আর এক নাটকীয় সাক্ষাৎকার। তবে আমার মন তখন অন্যত্র বিচরণ করছিল। কিউ চিনকে এরকম অবস্থায় দেখে সেরকম কোন কৌতূহলের উদ্রেক হল না।

ওর দিকে চাইতেই ও হেসে বললে, কোথায় যাচ্ছো, দেখেশুনে পা বাড়াও।

আমি সচকিত হয়ে দেখলাম যে চলতে চলতে আসল পথ ছেড়ে একেবারে জলাশয়ের ধারে এসে পড়েছি। আর একটু হলেই···। যাক সামলে নিলাম।

কিউ বললে, তোমাদের ক্লাশে আজ যখন রোমান্টিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমিও শুনতে গিয়েছিলাম। কারণ রোমান্টিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমারও একটু উৎসাহ আছে। আর সেখানে দেখলাম চিত্রতারকার মত তোমার রোমান্টিক অভিনয়। চমৎকার!

ওকি সত্যি সত্যি আমাদের ক্লাশে গিয়েছিল। বেশ একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। কেন জানি না কিউর কাছে আমি কিছুতেই সহজ হতে পারি না। নিজেকে কেন জানি একটু ছোট মনে হয়। ও আমার চাইতে কি হিসেবে বড় ঠিক বুঝতে পারি না। ওর উপহাসের জবাব কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম। বললাম, জানোই তো, সমস্ত পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ আর আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পার্ট অভিনয় করে যাচ্ছি।

কিউ তখনি জিজ্ঞেস করল, তোমার ভূমিকা সেখানে কি? গায়িকার, না পূজারীর, না গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

একটু থেমে মাথা নেড়ে বললে, না, তোমার ভূমিকা হবে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন সংশয়বাদীর। খুব ছোট্ট ভূমিকা।

কথাটা আমার মনে গিয়ে বিঁধল। দায়িত্বজ্ঞানহীন। এ বিষয়ে আমি কোনদিন কোন চিন্তা করেছি বলে মনে হয় না। তাই আমি অনেকক্ষণ ওর কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেব কেন! বেশ কঠিন সুরেই বললাম, আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন! দায়িত্ব! কার কাছে আমি দায়ী, কিসের জন্য আমি দায়ী আর আমার কাছেই বা কে দায়ী?

কিউ বেশ সহজভাবেই বললে, তুমি তোমার নিজের কাছেই দায়ী। প্রথমে নিজের দায়িত্ব নিজে বুঝে নাও তাহলে অন্যেরাও তোমার জন্য দায়ী হতে পারবে।

আর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। কিউর সুরও বেশ নরম হয়ে গেল। এবার সে খুব সহজভাবেই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। বললে, পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনদিন ধৈর্য হারাননি, তাঁদের কোন নালিশও ছিল না, তাঁরা কখনও আশাহীনও হননি। জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে তাঁরা তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের যুগে এখন আমাদের এমন কি অধিকার আছে যে আমরা একটা সহজ সুখের জীবন দাবী করব। আমরা কি পুতুল না খেলার সামগ্রী। আমাদের কাঁধে এখন অনেক বড় দায়িত্ব এসে গেছে, অনেক বড় বোঝা এখন আমাদের বহন করতে হবে। পথের বিঘ্ন এখনো দূর হয়ে যায়নি। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের এগুতে হবে। আর এই অভিযানে আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দায়িত্ব বহন করতে হবে।

কিউর কথাগুলো মনকে স্পর্শ করে গেল। শিরায় শিরায় বেশ একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠল। এর পরে আর তর্ক করা চলে না। তর্কের খাতিরে তর্ক করা যেতে পারে। শুধু কথা কাটাকাটি হবে, কোন লাভ হবে না, কোন অর্থ হবে না। আমি তাই আর তর্কের জের টানলাম না। আমি একটু আগ্রহ দেখিয়েই

বললাম, এরকম অবস্থায় তাহলে আমি বা আমরা কি করতে পারি বা কি করা আমাদের উচিত।

আমার চোখের ওপর চোখ রেখে কিউ উল্টে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি মনে হয় তুমি কিছু করতে পারবে।

আমি ? গলায় আমার কথা আটকে গেল।

এতদিন আমি উদাসীন বা হতাশগ্রস্ত ছিলাম। কোনদিন ভাবিনি আমারও কিছু করবার আছে বা করবার মত কিছু থাকতে পারে। কোনদিন ভাবিনি আমিও কিছু করতে পারি। আমি যেন হঠাৎ জেগে উঠলাম। একটা গভীর বেদনার সঙ্গে মনে হল আমারও কিছু করবার আছে।

এই বেদনার সঙ্গে কিছু আনন্দও পেলাম। কিউর কাছে আমি বারে বারে হেরে যাই। কিন্তু আমি জানি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কথা দিয়ে বা তর্ক করে আমাকে সহজে কাবু করতে পারবে না। কারণ আমার মন শুকনো মাঠ আর উষর পাহাড়ের কঠিন আবহাওয়ায় কঠিন হয়ে আছে। তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কিউওকি আমার মত ওই রকম অবস্থায় দিন কাটিয়েছে, ওই রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু তা যদি হয় তাহলে ও এত আশাবাদী হয়ে উঠল কেমন করে।

কিন্তু কেন জানি না, লোকটাকে আমার ঠিক পছন্দ হয় না। ওর কাছে আমি কেমন যেন ছোট হয়ে যাই। তখন নিজেকে বেশ ভাল করে সামলে রাখতে হয়, সব সময় সচেতন থাকতে হয়। ওর কথাগুলো কিন্তু মনকে বেশ নাড়া দিয়ে যায়, সতেজ করে তোলে। বেশ ভাল লাগে আর মনে হয় আমিও যেন কিছু প্রেরণা বা উৎসাহ পাই।

কিউর সম্বন্ধে কিন্তু আমি বিশেষ কিছুই জানি না। ওর অতীত আমার কাছে একেবারে অন্ধকারে। ওকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। সব কথারই জবাব দিয়েছে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়গুলি বেশ কায়দা করে এড়িয়ে গেছে। ওর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলে ও বেশ সহজভাবেই বলে যে কলেজে ঢুকবার আগে ও গ্রামাঞ্চলে টুকিটাকি কাজ করেছে। তারপর কলেজ থেকে পাশ করে গ্র্যাজুয়েট হবার পর এই কলেজে এসেছে রিসার্চ করবার জন্য। এছাড়া ওর কাছ থেকে আর কোন কথা বার করতে পারিনি।

তবে ওকে বেশ ভাল ছেলেই বলতে হয়। আমার মনে হয় অবস্থা এবং পরিবেশ আমাদের মানসিকতা গড়ে তোলে। কিউ বোধ হয় সহজ সরল অবস্থায় গড়ে উঠেছে।

১৩

কলেজ স্পোর্টস-এর ভেতর ভলিবল খেলাটা বেশ জনপ্রিয়। এবার বেশ একটা ইনটারেষ্টিং ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। একদিকে আমাদের কলেজের ছেলেদের টিম এবং অন্যদিকে প্রাদেশিক মহিলা ভলিবল টিম। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের খেলা। খেলাটা বেশ আকর্ষণীয় হবার কথা। তাছাড়া খেলাটা হবে সন্ধ্যার পর স্টেডিয়ামের ফ্লাড-লাইট জ্বালিয়ে।

খেলা দেখার ওপর আমার যে খুব একটা আগ্রহ আছে তা নয়। তবু মনে মনে ঠিক করলাম এই খেলাটা দেখতে যাব। জিয়া গুইচিকে অনেক খোসামোদ করলাম কিন্তু আমার সঙ্গে খেলা দেখতে যেতে ও কিছুতেই রাজী হল না। অন্য কেউও রাজী হল না। সামনে মধ্যবর্তী পরীক্ষা। সবাই বই খুলে মাথা গুঁজে বসে আছে। পরীক্ষা তো আমারও আছে কিন্তু তার জন্য আমি কোন চিন্তা করি না। মাঝে মাঝে হৈচৈ করতে আমার বেশ ভাল লাগে আর এরকম সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না।

অগত্যা আমাকে একাই যেতে হল খেলা দেখতে। একা একা মন্দ লাগছিল না। বেশ ভীড় হয়েছিল স্টেডিয়ামে, খেলাও বেশ জমে উঠেছিল। তবে আমার একটা মস্ত বড় দোষ এই যে আমার উৎসাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। কিছুক্ষণ খেলা দেখার পর বেশ হাঁপিয়ে উঠলাম। মন চলে গেল অন্যদিকে। আর ভাল লাগছিল না, তাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম।

কিউ চিনও খেলা দেখতে এসেছিল। বোধ হয় আমাদের কলেজের ছেলেদের উৎসাহ দিতে। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নজরটা কিউ

চিনের ওপর পড়ল। মাঠের ওপাশে লাইনের ধারে গালে হাত দিয়ে বসে ও বেশ মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছিল।

ওকে দেখেই একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ফসফস করে দু লাইন লিখে যে ঘরে বসে ওরা ধারা বিবরণী দিচ্ছিল সেই ঘরের দিকে গেলাম। ওদের একজনের হাতে বিশেষ অনুরোধ করে কাগজখানা দিয়ে দিলাম। তারপর স্টেডিয়ামে ঢুকবার গেটের কাছে একটা মোটা থামের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের ভেতরেই মাইকে ঘোষণা করা হল, কমপিউটার বিভাগের কমরেড কিউ চিন, আপনার জন্য একজন গেটের কাছে অপেক্ষা করছেন।

যারা ভলিবল খেলার ধারা বিবরণী শুনছিলেন তারা হঠাৎ এইরকম একটা ঘোষণায় বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং কে এই ভি আই পি দেখবার জন্য তাকাতে লাগলেন। কিউ চিনও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সকলের বিরক্তি উপেক্ষা করে একসকিউজ মি, একসকিউজ মি বলতে বলতে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে এল। খেলা দেখার চাইতে কিউর এই ব্যস্ততা বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হল।

গেটের বাইরে এসে কিউ এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল কে তার জন্য অপেক্ষা করছে দেখবার জন্য। আমি কিউর দিকে নজর রাখছিলাম, ওর বিব্রত ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিলাম।

কিছুক্ষণ ওর ব্যস্ততা দেখলাম। তারপর অতিকষ্টে হাসি চেপে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেম। আমাকে দেখে কিউ থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম, খেলাটা তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না। আমারও ভাল লাগছিল না, যে ভীড় আর গরম।

হুম! বলে কিউ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর চোখ বুঁজে কপালে একটা আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, আমি দেখছি বোকা বনে গেলাম।

আমি আর হাসি সামলাতে পারলাম না। খিলখিল করে হেসে উঠলাম। ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল, বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধ মন্দ লাগছিল

না। পরিবেশ বেশ মনোরম হয়ে উঠল। বললাম, আপশোষ করে কোন লাভ নেই। এবার তুমি তোমার জায়গায় গিয়ে আবার খেলা দেখতে পার।

মনে মনে হাসলাম। বেশ জব্দ করেছি। তবে কেন জানি না, এই জয়ের আনন্দ তেমন সহজ সুন্দর বলে মনে হল না।

আলো ঝলমল মাঠের দিকে কিউ একবার তাকাল, তারপর আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে বললে, তুমি ! না, না।

কিউ তার মাথাটা এমনভাবে নাড়ল যেন আমাকে বোঝাতে চায় এমন কম্ম আমি করতে পারি না।

ওর এই চাহনির কাছে আমি খুব সংকুচিত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম আমার সম্বন্ধে ওর মনে বেশ একটা উঁচু ধারণা ছিল। সেই ধারণায় ও আঘাত পেয়েছে। আমিও বেশ একটা আঘাত পেলাম। ওর কাছে ছোট হয়ে গেলাম। মনে হল আমিই হেরে গেলাম ও জিতে গেল। আমি চুপ করে কুণ্ঠিতচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না।

কয়েক মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। কিউ কি ভাবছিল কে জানে। হঠাৎ বলে উঠল, ঠিক আছে, চলো যাই।

এই বলে একটু অপেক্ষা করে কিউ পা বাড়াল। পিছন ফিরে একবার আমাকে দেখে নিল। ও ঠিকই বুঝেছে আমিও ওর পিছন পিছন যাব।

স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা যে ফুটপাত আছে সেই পথ দিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। চলতে চলতে কিউ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ছেলেমানুষই থেকে যাবে ? বড় হয়ে উঠতে ভয় পাচ্ছ ?

এইরকম একটা প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আর এরকম প্রশ্নের কোন জবাবও দেওয়া যায় না। তাছাড়া এটা আসলে প্রশ্ন না ভর্ৎসনা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম।

কিউ আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি কিছুই ভাল লাগে না ? সব সময় একটা বিরক্তি একটা অতৃপ্তি অনুভব কর এবং খুব অস্থির চিত্ত হয়ে ওঠো ?

আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, ভাল লাগবে না কেন? অনেক কিছুই ভাল লাগে তবে বেশীক্ষণের জন্য নয়। অল্পতেই আমি হাঁপিয়ে উঠি তারপর বিরক্তি ধরে যায়।

আমার কথা শুনে কিউ হো হো করে হেসে উঠল। বললে, এবার বুঝতে পেরেছি। তোমার এই বিরক্তির একজন শিকার হলেন অধ্যাপক কিং এবং আর একজন শিকার হলাম আমি।

এই বলে কিউ আবার হাসতে লাগল।

এমন সময় আমার এক বান্ধবী আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সেই সময় কিউ খুব হাসছিল। তাই আমার বান্ধবীটি আর দাঁড়াল না। একটু ইতস্তত: করে কেমন আছ বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কিউর হাসি হঠাৎ থেমে গেল।

আমি বললাম, ও কিছু নয়।

কিউ এবার বেশ সিরিয়াসলি বললে, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছো যে তোমার এই প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায়।

পরিবর্তন! এরকম চিন্তা কোনদিন মনে এসেছে বলে তো মনে হয় না। তাই বললাম, ওটা কি একটা ভেবে দেখবার মত বিষয় হল?

কিউ বেশ শান্তভাবেই বললে, পরিবর্তন হল জীবনের গতি। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তন এসে যায়। তবে মাঝে মাঝে এই গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ভেবে দেখা দরকার কেন এই গতি রুদ্ধ হল। আর যে সব কারণে এই গতি রুদ্ধ হয়ে যায় এক এক করে সেই সব কারণগুলো অপসারণ করবার চেষ্টা করতে হয়। তুমি কি সেরকম কোন চেষ্টা করেছ?

ঘন ঘন হর্ষধ্বনি ও চীৎকার খেলার মাঠ থেকে আসছিল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খেলার মাঠটাকে বেশ আলো ঝলমল দেখাচ্ছিল। ওদের আনন্দ কোলাহলে একটা জীবনের স্পন্দন অনুভব করছিলাম। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখে কিউ বলে যেতে লাগল, আচ্ছা, সবার থেকে দূরে সরে থেকে তোমার কি নিজেকে অসহায় এবং নি:সঙ্গ মনে হয় না?

খেলার মাঠে ভীড়ের ভেতর তোমার দম বন্ধ হয়ে আসে, হট্টগোল সহ্য হয় না। কিন্তু তোমার কি কখনো মনে হয়নি, এরই নাম জীবন।

ওর বক্তৃতায় অস্থির হয়ে আমি বললাম, তুমি বেশ বক্তৃতা দিতে পারো। তবে তোমার সব কথা আমার কাছে হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে।

এবার কিউ আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল। বললে, তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি অনেক কিছু দেখেছ, অনেক কিছু সহ্য করেছ, অনেক বিপদের মোকাবিলা করেছ। তা সত্ত্বেও এই বয়সে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে চাও কেন? কেন এই বৈরাগ্য, কেন এই অনীহা, কেন এই অতৃপ্তি, কেন এই ক্লান্তি? আমাদের প্রত্যেকেরই শক্তি সামর্থের একটা সীমা আছে তা অস্বীকার করব না। এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না। কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের জানবার চেষ্টা করতে হবে, বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, সব কিছু ভেবে দেখতে হবে। বারে বারে হয়ত চেষ্টা করতে হবে কিছু না করার চাইতে একটা কিছু করা অনেক ভাল। সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন তার সঙ্গে আপোস করা কখনো ঠিক হবে না।

ওর কথাগুলো শুনে বললাম, তুমি এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পার যে রাজনীতি প্রচারের চাইতেও ভাল লাগে।

কিউ তবুও বোঝাবার চেষ্টা করল। বললে, তুমি তোমার আত্মসমর্থনে যাই বল আর যাই ভাব না কেন, তুমি খুব ভুল পথে চলেছ। এতদিন কি অবস্থায় তোমার দিন কেটেছে আমি ঠিক জানি না। তবে সে সব অবস্থা যতই দুঃসহ হয়ে থাকুক না কেন, এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো আর নেই। তোমারও এখন পরিবর্তন দরকার। সমাজ-জীবনে তোমার অনেক কিছু দেবার আছে, দিতে হবে। তা থেকেই বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওর সুর নরম হতে হতে একেবারে কোমল হয়ে গেল।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। এখন ফুটপাত ছেড়ে একেবারে একটা মাঠের ওপর দিয়ে চলেছি। রাত্রির অন্ধকারে একটা মাঠের ভেতর দিয়ে আমরা যেন মিলিয়ে যাচ্ছি।

কিউর কথাগুলো মনের ভেতর ঘোরাঘুরি করতে লাগল। আমার মনে হল এরকম কথা আরো অনেকবার শুনেছি। কিন্তু আজ মনে হল আমি আমার এক পুরোনো বন্ধুকে যেন খুব কাছে পেলাম।

কিউর দিকে তাকালাম। আবছা অন্ধকারে ওকে দেখে মনে হল ও আমার অভিভাবক হতে পারে, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পথ-প্রদর্শক বন্ধু হতে পারে।

কিউকে নিয়ে মজা করার এই ফল হল। জীবনটা সত্যি নানারকম ধাঁধায় ভরা।

১৪

সকালে উঠেই জিয়া শুইচি আমাকে ধরল এবং প্রথমেই প্রশ্ন করল কাল রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আমি একটু অবাক হয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, এরকম প্রশ্ন করছো কেন? তুমি তো জান কোথায় গিয়েছিলাম।

বললে, সে তো জানি, কিন্তু খেলা দেখার পর কোথায় গিয়েছিলি?

বুঝতে পারলাম কাল রাতে যে সহপাঠিনীটি আমাদের দেখে ফেলেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই কিছু রটিয়েছেন। জিয়ার প্রশ্নটা বুঝতে পেরে আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। বললাম, ও সেই কথা। কাল তোর বয়ফ্রেণ্ডকে নিয়ে ইলোপ করবার চেষ্টা করছিলাম।

—দেখ ঠাট্টা ভাল লাগে না, এই বলে জিয়া গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

ওকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, না রে, তোর কোন ভয় নেই। বড় শক্ত পাথর, একটুও নড়াতে পারলাম না।

তবু জিয়ার গাম্ভীর্য গেল না। তখন ওকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললাম। এবার জিয়াও ফিক করে একটু হেসে ফেলল।

আজ আবার আর একখানা বেনামী চিঠি পেলাম। ছোট্ট চিঠি, ভাবাবেগে ভরা। এবার লেখক প্রথমেই আমাকে তার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আমার জীবন যেন অনন্ত সুখের হয় এইরকম একটা সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারপর জানতে চেয়েছেন কে সেই সুন্দর যার হাত ধরে আমি রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। সেই ভাগ্যবান লোকটির ওপর লেখকের একটুও ঈর্ষা নেই—একথাও লেখক জানিয়েছেন। পরিশেষে লেখক জানালেন যে তার বাগানেও একটি ফুল ফুটেছে, সেই ফুলটির নাম ব্লীডিং হার্ট!

এই ছেলেটির প্রথম চিঠিতে একটা সুস্থ মনের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এই চিঠিটার ভেতর একটা নোংরা সংকীর্ণ মনের পরিচয় পেলাম। চিঠিখানাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।

১৫

স্টাডি রুমে জ্বি-লাই কাচের জানালার শার্সির ওপর মাথা রেখে চোখ বুঁজে প্রাচীন কবিতার ওপর লেখা অধ্যাপকের নোট মুখস্থ করছিল: প্রথমে ভাল উপযুক্ত ইডিয়ম, দ্বিতীয়তঃ কিছু প্রাকৃতিক বর্ণনা, তৃতীয়তঃ বসন্তের মেঘ ভাসে…

আমি বলে উঠলাম, ওহে সুকন্ঠি, বসন্তের মেঘ ভাসে কথাটার অর্থ কি?

ও চোখ না খুলেই বললে, মেঘেরা তো ঘন ঘন বদলায়, তারই কথা হবে হয়ত। এই নিয়ে ভাবতে হবে না। কারণ অধ্যাপক এইরকম কথাই লিখিয়ে দিয়েছেন। আর এইসব কথা যদি না লেখো তাহলে তোমার নম্বর কাটা যাবে।

জ্বি-লাই আমাকে একটা ভাল উপদেশ দিয়ে দিল।

এ আর একটা ফ্যাসাদ। অধ্যাপক যা পড়িয়ে যাবেন, যা বলে যাবেন, যা লিখিয়ে যাবেন সেইসব কথা মুখস্থ করতে হবে এবং পরীক্ষার খাতায় সেইসব কথা হুবহু লিখতে হবে। মৌলিক কোন উদাহরণ বা নতুন কোন উপমা দেওয়া চলবে না। তাছাড়া গত তিরিশ বছরের ভেতর আমাদের পড়ার বইগুলো বদলানো হয়নি। সবাই দেখছি এতেই অভ্যস্ত। কেউ পরিবর্তন চায় না।

অধ্যাপকদের দেওয়া নোট, ব্যাখ্যা মুখস্ত করবার ইচ্ছা আমার হল না। আমি সমস্ত নোটগুলো ভাল করে পড়ে নিলাম, যতটা মনে থাকবার থাকবে। নোট মুখস্ত করাটা বড় একঘেয়েমী বলে মনে হল। বেশীক্ষণ বইখাতা নিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগল না। আমি উঠে পড়লাম।

স্টাডি রুমের বাইরে এসে হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বলেছিলেন, মানে প্রশংসা করেই বলেছিলেন, তুমি তো বেশ অভিনয় করতে পার, তাহলে কলেজের ড্রামা ক্লাবে নাম দিচ্ছ না কেন? তখন কথাটার গুরুত্ব দেইনি। আজ মনে হল বাবার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে গাছের ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। অন্য সব মেয়েরা পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত, আমি পথে একা।

কলেজের দিকেই যাচ্ছিলাম। কলেজে ঢুকবার পথে কলেজের নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ নজরে পড়ল। নোটিশটা পড়লাম।

নোটিশ

ইউনিভারসিটি এবং সমস্ত কলেজের যুক্ত উদ্যোগে শীঘ্রই বসন্ত উৎসব হইবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নূতন নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রয়োজন। যে কোন বিষয় লইয়া নাটক রচনা করা যাইতে পারে। যোগদানে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা লাল কাগজে ছাপা আবেদনপত্র লইয়া ছাত্র ইউনিয়নের দপ্তরে যোগাযোগ করিতে পারেন। আবেদনপত্রগুলি বাঁ-পাশে রাখা আছে।

নোটিশটা পড়ে আনন্দে মনটা নেচে উঠল। এই তো করবার মতো একটা কাজ পাওয়া গেল। কালই তো কিউ বলেছিল কিছু না করার চাইতে কিছু করা ভাল। এবার কিউকে হঠাৎ একদিন চমকে দিতে হবে।

আবেদনপত্রগুলো একটা পিনে গাঁথা ছিল, পাশেই ঝোলান ছিল। আমি একটা আবেদনপত্র ছিঁড়ে নিলাম।

আমাদের ইউনিয়নের লাল বাড়ীটার ভেতরে ঢুকবার আগে একটু ইতস্তত: করলাম। গত দু বছর ধরে আমি এই কলেজে আছি। আমি কদাচিৎ ইউনিয়নের কোন ফাংশনে যোগদান করেছি। ঠিক মনে করতে পারলাম না শেষ কবে এই বাড়ীতে ঢুকেছিলাম। সব কেমন যেন নতুন নতুন লাগল। ঢুকবার হলঘরটা আমার কাছে চেনা চেনা বলে মনে হল না। করিডরটাও মনে হল এরকম আগে দেখিনি। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, আমি এখানে এলাম কেন? একটা সংশয় মনের ভেতর জেগে উঠল। আবার কি তামাসা করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে! মনকে সংযত করলাম। না, এবার একটা নতুন উদ্যোগে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সব ভুলে থাকতে চাই। একটা নতুন সম্ভাবনায় আমার মনে একটা শিহরণের দোলা দিয়ে গেল। আমি মেহগনি দরজাটা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে কিউ চিন বসে আছে।

আমায় দেখে কিউ হেসে বললে, আমি জানালা দিয়ে দেখছিলাম, তুমি একটা আবেদনপত্র নিয়ে এই দিকেই আসছো। তুমি কি জানতে আমি এই ব্যাপারটার চার্জে আছি।

আমি হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বললাম, আবার তোমার পাল্লায়ই পড়তে হল।

কিউ বেশ গম্ভীরভাবে বললে, না, আমিই আবার তোমার পাল্লায় পড়লাম।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

১৬

প্রায় দু সপ্তাহ হবে। হয়ত বেশীই হবে। আমি আমার কাজের ভেতর একেবারে ডুবে গেছি। এরকম উৎসাহ আমি আগে কোনদিন পাইনি।

কিউ চিন এক হিসেবে আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট নয়। কারণ সে কমপিউটার বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠান তাকে এখানে পাঠিয়েছে স্কলারশিপ দিয়ে কমপিউটার নিয়ে গবেষণা করতে। আবার এক হিসেবে তাকে এই কলেজের স্টুডেন্ট বলা যায় কারণ সে এই কলেজেই গবেষণা করছে। স্টুডেন্ট হোক আর নাই হোক সে আমাদের কলেজের অনেক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে। কারণ কিউকে আমাদের ইউনিয়নের P. R. অর্থাৎ জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা করা হয়েছে। আমি যখন নিজে থেকেই আবেদনপত্রে নাম লিখে যোগাযোগ করলাম এবং একটা কিছু লিখবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম তখন কিউ আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল এবং কিছু মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছিল। সেই থেকে লিখবার আগ্রহ আমার দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের নিজেদের কথা, আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, প্রত্যাশা-হতাশা এইসব মনের ভাবনাগুলো কথা দিয়ে, ঘটনা দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এসব আবার স্টেজে অভিনয় করে সকলকে দেখানো হবে। এইসব ভাবতেও মনটা বেশ একটা আনন্দ উত্তেজনায় ভরে উঠল। মোটামুটি একটা প্লট খাড়া করে চরিত্রগুলো সাজালাম, তারপর লিখে চললাম পুরোদমে। একটা ট্র্যাজেডির পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আর এমন-ভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজালেম যে পরে যতবার নিজের লেখা নিজে পড়েছি ততবারই কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। আমার ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু এর ভেতর স্থান পায়নি, সেগুলো আর প্রকাশ করিনি। সেগুলো আমার নিজের বুকেই ঘুমিয়ে থাকুক।

এই নাটকটা লিখবার জন্য আমি আমার নিজের লেখাপড়ার ওপর বিশেষ নজর দিতে পারিনি। অধ্যাপকদের দেওয়া নোটগুলোও উলটে

পালটে দেখবার সময় করে উঠতে পারিনি। এদিকে পরীক্ষার দিনও ঘনিয়ে এল। যদিও এটা মধ্যবর্তী পরীক্ষা তবুও এটা অবহেলা করা চলে না। তাই পরীক্ষার কিছু আগে বেছে বেছে কয়েকটা ইমপরট্যাণ্ট বিষয়ের ওপর অধ্যাপকদের দেওয়া নোট মুখস্ত করে নিলাম। তারপর নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি তো আছেই। যা হোক পরীক্ষা দিয়ে দিলাম। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। অধ্যাপকদের দেওয়া নোটেরও উল্লেখ করলাম। তবে কি রকম পরীক্ষা দিলাম তা অবশ্য বলতে পারি না।

আমার লেখা নাটকটা যখন কিউর হাতে দিলাম তখন ওকে একটু ঠাট্টা করেই বললাম, দেখ, প্রাচীন চীনা সাহিত্যে যদি ফেল করি তাহলে তোমরা তোমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে একটা চিঠি দিয়ে দিও যে কলেজের নাটক উৎসবের জন্য নাটক লিখতে ব্যস্ত ছিল বলে, কমরেড লি পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি। অতএব তাকে যেন পাশ করিয়ে দেওয়া হয়।

আমার এ পরিহাস কিউ গ্রাহ্য করল না।

আমার নাটকটা উলটে পালটে দেখতে দেখতে কিউ বললে, তোতাপাখির মত নোট মুখস্ত করে সেইগুলো আবার উগ্রে দেওয়ার চাইতে তোমার এই কাজটা অনেক ইনটারেস্টিং, তাই না!

আমি বলে উঠলাম, হায়, তুমি যদি আমাদের প্রধান অধ্যাপক হতে!

১৭

নাটকটা জমা দেবার কিছুদিন পরে একদিন কিউ আমার কাছে এল নাটকটা নিয়ে কিছু আলোচনা করবার জন্য। কথায় কথায় প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের কথা উঠল। আমি তখনি বুঝতে পারলাম কিউ আমাকে কি বোঝাতে চায়। কিউ আমাকে বোঝাতে চাইল যে গ্রীক নাট্যকার এসকুলাসের মত আমিও ভাগ্যের কাছে অসহায়, পরাজিত। গ্রীক

নাট্যকার ইউরিপিডেস কিন্তু অন্য প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং চ্যালেঞ্জ করে ভাগ্যকে নিজের মত পরিবর্তন করবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। গ্রীক নাট্যকারের এই সূত্র অবলম্বন করে কিউ বললে, আমরাও অতীত ঘটনাগুলোকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। মর্মান্তিক ঘটনা অনেক ঘটেছে, তার তালিকার চাইতে সেই ঘটনাগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বললাম, তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবে ?

কিউ বললে, তাহলে তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। ধর, একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। এই ঘটনার পিছনে অন্ততঃ দুটি পার্টি আছে। এক পার্টি অত্যাচার করে আর এক পার্টি অত্যাচারিত হয়। যে পার্টি অত্যাচার করে তারা অত্যাচার কেন করে তার একটা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আর যারা অত্যাচারিত হল তারা এই অত্যাচার কেন সহ্য করে তারও একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা একটা পরিবর্তনের সূত্র পেয়ে যেতে পারি। ভাগ্যকে এইভাবেই চ্যালেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু শুধু যদি মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর তালিকা দিয়ে যাই তাহলে কি ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয় ?

কিউ বেশ গুছিয়ে বলতে পারে। ভাগ্য ওর প্রতি সব সময় প্রসন্ন ছিল বোধ হয়। তাই বোধ হয় ও এত আশাবাদী। মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর যে তালিকার কথা ও উল্লেখ করল, তা আর কিছু নয়, আমার নাটকেই সেই-সব ঘটনা আছে। আর এইসব ঘটনা প্রকাশ করবার জন্যই আমি দিনরাত পরিশ্রম করেছি। কিন্তু তাই বলে কি আমি পরাজয় স্বীকার করেছি। কিউ বোধ হয় এইসব ঘটনার প্রকাশ পছন্দ করেনি। ওর জীবনে কি এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি ! তাই হঠাৎ বলে উঠলাম, ভাগ্যের কাছে পরাজয় আমি স্বীকার করিনি। তবে আমি যদি তোমার মত হতাম আর সেই দুদিনে ইউনিভারসিটিতে ঢুকবার সুপারিশ পেতাম

তাহলে আজ আমি সমাজের অনেক উঁচু স্তরে চলে যেতে পারতাম। তোমার কি মনে হয়?

ওকে একটু আঘাত দেবার জন্যই বলেছিলাম এবং ঠিক ওর মনে গিয়ে লাগল। অনেকক্ষণ ও শুধু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে বললে, মর্মান্তিক ঘটনা আমিও অনেক দেখেছি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এক করুণ কাহিনী আছে। তুমি কি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে? তোমার নাটকের ভেতর এই কাহিনীটাও জুড়ে দিতে পার।

আমি চুপ করে রইলাম। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ মনে করে কিউ বলতে লাগল, আমি শুনলাম। কাহিনীটা সত্যই মর্মান্তিক। জোয়ান ছেলের সামনেই বৃদ্ধ বাপকে পিটিয়ে খুন করা হল। তারপর ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এক জঙ্গলে ঘাস কাটবার জন্য। ছেলের মা'কে তো রাস্তায় ঝাড়ু দেবার কাজে আগেই লাগান হয়েছিল। তিনি একখানা কাঁথা সম্বল করে রয়ে গেলেন।

কিউ আরো অনেক কথা বলে যেতে লাগল কিন্তু আমি আর সেদিকে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। আমার মন চলে গেল অনেক দূরে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কিউর সেই বন্ধুটি আর কেউ নয়, সে নিজেই। নিজের কথাই যে একটু ঘুরিয়ে বলেছে। আমার সমস্ত অন্তর ব্যথিয়ে উঠল এই লোকটা সম্বন্ধে কত না অন্যায়ভাবে চিন্তা করেছি। নিজেকে মস্ত বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। ইচ্ছে হল ওর কাছে এখনি আমি ক্ষমা চেয়ে নি। কিন্তু সাহস হল না। আর কোন কথা বলতেও পারলাম না।

একবার প্রসঙ্গটা বদলাবার একটু চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাও পারলাম না।

কিউ অনেক কথাই বলে গেল। ওর কথা শেষ হলে আমি কোনরকমে বললাম, এসব লিখে ফেলনা কেন, তাহলে তো সকলেই জানতে পারবে।

কিউ আমার কথাটা ঘুরিয়ে আমাকেই আবার বোঝাতে চেষ্টা করল। বললে, অতীতের স্মৃতিচারণ করবার চাইতে অতীতকে বুঝবার চেষ্টা করা

অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারই ভেতর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। আমাদের উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক গ্রাম আছে। সেখানে গ্রামের লোকেরা কি করতো জানো? সেখানে কারো যদি কোন অসুখ করতো তাহলে তারা একজন ওঝা বা একজন সাধুকে ডাকাতো, আর না হয় যা হবার তাই হবে বলে চুপ করে বসে থাকতো আর ভগবানকে ডাকতো। আমাদের এই বন্দর শহরে যারা থাকে তারাও সেই একই ধরণের সংস্কার মেনে চলে। কেন এইভাবে চলতে হবে এরকম প্রশ্ন কেউই তোলে না। এখনো এই যুগে কেন এইসব জিনিস আছে, কেন এইসব জিনিস চলছে তার একমাত্র কারণ হল আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই বলেই মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অন্ধবিশ্বাস আমাদের সকল চিন্তা, সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে আর সকলকেই ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। নীরবে সব সহ্য করা, সব কুসংস্কার মেনে চলার অর্থই হল ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। কাজেই বুঝতে পারছো আমাদের লেখার সময় এসব বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। তাহলে আমরা অতীতকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে এবং বোঝাতে পারব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে পারব। ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে কাজ করা দরকার।

আমাদের আলোচনা আরো অনেকক্ষণ চললো। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমাদের এই নাটকটাকে আবার নতুন করে নতুন আলোয় তুলে ধরতে হবে। কিউ রাজী হয়ে গেল, আমরা দুজনে মিলে নাটকটাকে আবার নতুন করে সাজাব।

কিউ চলে গেল। তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। স্টাডি রুম থেকে সকলেই চলে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে বনফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল।

হঠাৎ মনে হল আমি যেন বদলে গেছি।

১৪

আমি এবং কিউ দুজনে মিলে নাটকটাকে আবার নতুন করে সাজালাম। শনিবার নাটকটার পাণ্ডুলিপি নিয়েই বাড়ী এলাম। বাবাই আমাকে ড্রামা ক্লাবে যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। কাজেই আমার প্রথম উদ্যম তাঁকে দেখানো দরকার।

বাড়ী এসে দেখি পাই পিং চুপচাপ বসে আছে। বাবা তখনো বাড়ী ফেরেননি। পাই পিংকেই নাটকটা পড়তে দিলাম।

পাই পিং বেশ আগ্রহ সহকারেই নাটকটা নিল এবং বেশ ধৈর্য ধরেই পড়ল বলে মনে হয়। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল নাটকটা পড়ে ফেলতে। পড়া শেষ হলে সে তার জামার বোতামটা খুঁটতে খুঁটতে বললে, তোমার নাটকটার বিষয়বস্তু হল এক তরুণ যুবক অনেক রকম নির্যাতন ভোগ করল, তারপর সে শক্তি এবং সাহস সঞ্চয় করে বুরোক্রেসির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রুখে দাঁড়াল।

আমি মনে মনে ভাবলাম আমাদের বাস্তব জীবনে আমিও কি আমার হিরোর মত সাহস পাব! পাই পিংকে বললাম, তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছো।

পাই পিং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, তুমি! তুমি!

ওর গলায় কথা আটকে গেল।

বললাম, তোমার গলা শুকিয়ে উঠেছে। একটু চা খেয়ে নাও।

ফ্লাস্ক থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে ওকে দিলাম।

চা পান শেষ করে বেশ শান্তভাবে পাই পিং বলতে লাগল, দেখ, আমাদের এই বিরাট দেশে বিরাট জনসংখ্যা। তাদের হাজার হাজার সমস্যা নিয়ে আমরা কি-ই বা করতে পারি। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়াও এবং আজকের জীবনকে মেনে নেবার চেষ্টা কর। তাতে শান্তি পাবে, সুখীও হবে।

এরকম কথা আমি আগে অনেকবার শুনেছি। আজ আর ভাল লাগল না। ওর মন বুঝবার জন্য আমি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলতো এই নাটকটাকে আর কিভাবে উন্নত করা যায় ?

—আমার মতে, —ও বলতে আরম্ভ করল, তারপর থেমে গেল। কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর আবার বললে, নাটকটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। কি হবে এসব করে! কোন লাভ হবে না। তোমার এখন উচিত লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়া, ভাল করে পরীক্ষায় পাশ করা, তারপর একটা ভাল কাজ জুটিয়ে নেওয়া। তারপর সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দিতে পার।

আমি রাগ করে বলে উঠলাম, তুমি যে কী বোঝা মুস্কিল। কলেজের একটা কাজে হাত দিয়েছি কোথায় একটু উৎসাহ দেবে, না উলটো গাইতে শুরু করেছ।

আমি গুম হয়ে বসে রইলাম।

লোকটা সত্যি অসম্ভব। বাবা অন্ততঃ আশা করেন দেশের জন্য আমিও কিছু করি। উৎসাহ দিয়েছেন কলেজের ড্রামা ক্লাবে যোগ দিতে এবং অংশ নিতে। আর পাই যা চায় তাহল আমি যেন ওর উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারি।

আমাকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে পাই হঠাৎ বলে উঠল, ওহো ; একটা সুখবর তোমাকে তো বলাই হয়নি। একটা সুখবর আছে। খুব শীগগিরই আমার পদোন্নতি হবে। আমি জনসংযোগ বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর হব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, কংগ্রাচুলেশন।

—আমার সৌভাগ্যে তো তোমারও সৌভাগ্য, তাই না, এই বলে ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো আনন্দে নাচছিল। ওর হাত ধরে বললাম, আমার সৌভাগ্যে কিন্তু তুমি আনন্দ পাও না।

এত বড় একটা সুখবরের পর আর অন্য কোন আলোচনা নয়, বলে পাই উঠে পড়ল।

পাই পিং চাকরী করে, পদোন্নতির স্বপ্ন দেখে। কেরানিগিরির মানসিকতা ওকে পেয়ে বসেছে। এই রকম প্রকৃতির লোকেরা যদি আমার নাটক উপভোগ করে তাহলে আমিই লজ্জা পাব।

কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে খুব ছোট শিশুর মত মনে হল। মনে হল, যেন স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করছি। পরক্ষণেই সে ভাব কেটে গেল। এখন আমি বেশ বড় হয়েছি এবং জীবনকে বুঝতে পারছি। এখন আমি আমার জীবন এবং আমার কাজ নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। পাই-এর সঙ্গে এখন আমার আকাশ পাতাল তফাৎ। সুমেরু আর কুমেরু।

পাই চলে গেলে নাটকটার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি বাবার ঘরে গেলাম। বাবা ঘরে ছিলেন না। টেবিলের ওপর একগাদা ফাইল। সেই ফাইলগুলোর ওপরে পাণ্ডুলিপিটা রেখে সঙ্গে একটা ছোট চিঠি লিখে দিলাম:

বাবা,

আমাদের ড্রামা উৎসবে অংশ নেব বলে মনস্থ করেছি। তুমি আমাকে যোগ দিতে উপদেশ দিয়েছিলে। তবে যোগ দিচ্ছি ঠিক এই কারণেই নয়। আরো অনেক কারণ আছে। পাণ্ডুলিপিটা পড়লেই বুঝতে পারবে।

—লি

বেশ হাল্কা হৃদয়ে আমি শুতে গেলাম।

১৯

আমি প্রতি শনিবার কলেজ থেকে বাড়ী আসি, রবিবার বাড়ীতেই থাকি এবং সোমবার সকালে কলেজে ফিরে যাই। আজ সকালে আমাকে একা ব্রেকফাস্ট খেতে হল। বাবা ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছেন। এ-রকম মাঝে মাঝে হয়।

কলেজে যাবার আগে বাবার ঘরে গেলাম। টেবিলের ওপর দেখলাম আমার নাটকের পাণ্ডুলিপিটা সেইভাবেই পড়ে আছে। চিঠিটাও। বুঝতে পারলাম বাবা সময় করে উঠতে পারেননি। বাবাকে না দেখিয়ে কোন কিছু করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আর দেরী করা ঠিক হবে না ভেবে আমি পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিলাম এবং কলেজে চলে এলাম।

কলেজে এসেই কিউকে নিয়ে আমাদের ড্রামা ক্লাবে এলাম। নাটকটার জন্য পাত্রপাত্রী ঠিক করতে হবে। কিউ তালিকা করতে বসে গেল। আমি অনুরোধ জানালাম আমাকে যেন ছোট একটা পার্ট দেওয়া হয়।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার এত উৎসাহ হঠাৎ কোথা থেকে এল। কিছুদিন আগেও তো, মানে এই নাটকটা লিখবার আগে তো আমার এত উৎসাহ ছিল না।

১০

মিডটার্ম পরীক্ষার ফল বের হল। আমি অনার্স পেলাম না। অনার্সের জন্য একশো নম্বরের ভেতর অন্ততঃ আশি নম্বর পাওয়া চাই। আমি পেলাম চুয়াত্তর নম্বর। কাজেই ধরে নিতে হবে আমি পরীক্ষায় ফেল করলাম। অধ্যাপকদের দেওয়া নোট মুখস্থ করে লিখতে পারলে নব্বই-পঁচানব্বই নম্বর পাওয়া মোটেই কঠিন ছিল না।

ক্লাশে আমাদের পরীক্ষার খাতাগুলো ফেরত দেওয়া হল। দেখলাম, একটা প্রশ্নের জবাব আমি ঠিকমত দিতে পারিনি। ঠিক মানে অধ্যাপক যা লিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কথাগুলো আমি লিখতে পারিনি। আমি নিজের কথায় নিজের মতন করে উত্তর লিখেছিলাম। এই প্রশ্নটায় দশ নম্বর ছিল। আমি একটা গোল্লা পেয়েছি।

জিয়া গুইচি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, এই রেজাল্টে ঘাবড়ে যেও না। মনোযোগ দিয়ে পড়, অনেক ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

জি লাই বেশ স্পষ্ট ভাষায় সকলকে শুনিয়ে বললে, আমার কিন্তু মনে হয় লির আলোচনা আমাদের সকলের চাইতে ভাল হয়েছে। কারণ ওর আলোচনার ভেতর নতুন ভাবনা-চিন্তা আছে। আমরা তো মুখস্থ করেছি আর তাই লিখেছি। আমাদের লেখার ভেতর নিজস্ব কিছুই নেই। তাতেই আমি নব্বই নম্বর পেয়ে গেছি।

ওদের আলোচনায় আমি মন দিলাম না। নাটকটা নিয়ে আমাকে এত ব্যস্ত হতে হল যে অন্য কোনদিকে মন দিতে পারলাম না। এখন আবার রিহারসেল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। নাটকটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন কাজে সময় পাব বলে মনে হয় না।

২১

আমাদের ইউনিয়ন ঘরে জায়গা হত না বলে আমরা স্থানীয় অপেরা হলে আমাদের রিহারসেলের ব্যবস্থা করেছিলাম। কলেজের শেষে বিকেলের দিকে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে জুটতাম। সবাই মানে যারা পার্ট নিয়েছে, যারা এই বিষয়ে বেশ উৎসাহী, এবং যারা পরিচালনার ভার নিয়েছেন। তাদের ভেতর কিউও একজন।

ড্রামা সম্বন্ধে জিয়া গুইচির সেরকম কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কিউ চিন একজন লীডার হওয়াতে জিয়া গুইচিও খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, তোমাদের রিহারসেলে কি অনেক মেয়ে যায়? কিউ কি ওখানে সব সময় ব্যস্ত থাকে? এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন। আসল কথা কিউর জন্য ওর চিন্তা এবং সেটা আবার মুখ খুলে বলতে পারে না। আমি একদিন ওকে বললাম, তুমিও তো রিহারসেল কেমন হচ্ছে দেখবার জন্য যেতে পার। পার্ট নাওনি বলে ওখানে যেতে তো বাধা নেই।

আমার কথায় জিয়া গুইচিও মাঝে মাঝে রিহারসেলে যেতে আরম্ভ করল।

২২

দেয়াল ঘড়িতে টুং টুং করে আটটা বাজল। ঘড়িটার আওয়াজটা বেশ মিষ্টি। রিহারসেল চলছে। আজ আবার শনিবার। বাড়ী যাবার কথা। পাই পিং বোধহয় একা ঘরে বসে বসে অস্থির হয়ে উঠছে। মনে মনে হাসলাম। বেশ জব্দ হবে।

আরো প্রায় এক ঘণ্টা রিহারসেল চললো। প্রায় সকলেরই বাড়ী যাবার তাড়া। রিহারসেল শেষ হতেই যে যার পথে চলে গেল। কাগজপত্তর গুছিয়ে নিতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগল। অবশেষে আমরা তিনজন—কিউ, গুইচি এবং আমি বাস স্টপের দিকে চললাম। চলতে চলতে আলোচনা করছিলাম সাঁতার প্রতিযোগিতার। আলোচনাটাও বেশ জমে উঠছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল পাই পিং পথের ধারে একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ শুকনো, কপাল কোঁচকানো। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললাম, তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? তোমার কি হয়েছে?

পাই বললে, আমার কিছু হয়নি। তোমার কি হয়েছে তাই দেখতে এলাম।

বেশ মন ভার করে আছে বুঝলাম। আর ওতো প্রায় সব সময়ই মুখ ভার করে থাকে। কারণ আমার কোন কাজ ওর পছন্দ হয় না।

পাই পিংও আমাদের সঙ্গে বাস স্টপের দিকে চললো। চলতে চলতে বললে, তাড়াতাড়ি কর, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন রাত নটারও ওপর হবে। আজ আবার শনিবার, সে খেয়াল আছে?

এই বলে পাই বাঁ হাতটা তুলে ঘড়িটা দেখাবার চেষ্টা করল।

জিয়া গুইচি ফিসফিস করে বললে, তুমি একজন ভাল বডিগার্ড পেয়েছ।

কিউ স্বপ্রবৃত্ত হয়ে পাই পিংকে বললে, আজ দুবার করে রিহারসেল হয়েছে কি না তাই বেশ একটু সময় লেগেছে। সামনের সপ্তাহে আবার ড্রেস রিহারসেল হবে।

মুখখানা বিকৃত করে পাই পিং বেশ মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠল, রিহারসেল আর রিহারসেল!

পাই-এর এই মেজাজ দেখে কিউ এবং জিয়া দুজনেই কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। এরকম অভদ্র আচরণ ওরা নিশ্চয়ই আশা করেনি। কি করবে ভেবে না পেয়ে, আমরা চলি বলে ওরা চলে গেল। তাড়াতাড়ি বাস স্টপে গিয়ে একটা বাস পেয়ে উঠেও পড়ল।

এরকম অভদ্র ব্যবহার আমিও আশা করিনি। বুঝতে পারলাম এটা ও ইচ্ছে করেই করেছে। পরোক্ষভাবে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। আমি তাই বললাম, তোমার কি হয়েছে বলতো?

ও ফেটে পড়ল। বললে, কি হয়েছে জিজ্ঞেস করছো! আমি এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি আর তুমি বলছো তোমার কি হয়েছে!

আসলে রিহারসেল নিয়ে আমি এ-কদিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওর কথা মনেও আসেনি। আর এখানে এসে যে ও অপেক্ষা করবে তা ভাবতেও পারিনি। মনে করলাম, একটু অপরাধ বোধহয় হয়ে গেছে। তাই একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, সরি, ক্ষমা কর। এখন আমি তো এসে গেছি, চলো যাই।

আমার কথায় ও আরো যেন রেগে গেল। রেগে বললে, ওদের মতলব খুব ভাল নয়।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাদের কথা বলছো?

—তোমাকে ভাবতে হবে না। এর ফল ওরাই পাবে, এই বলে ও বাস স্টপের দিকে পা বাড়াল। দু'পা যেতে না যেতেই বলে উঠল, কি ছাই মাথামুণ্ডু তোমাদের এই নাটক হচ্ছে!

আমার নাটক নিয়ে কথা। চট করে রক্ত মাথায় উঠে গেল। আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না।

তারপর নিজেকে সংযত করে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বললাম, আমার সঙ্গে এই-রকমভাবে কথা বলবার, আমাকে এইরকমভাবে অপদস্থ করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?

আমার রাগ দেখে পাই পিং স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর লাল মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বললে, আমি জানতাম, এ রকম কিছু ঘটবে, আমি জানতাম।

ও বেশ কুণ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ওর জন্য একটুও দুঃখ হল না। আমি চুপ করে রইলাম।

একটা বাস এসে পড়ল। একটু নরম হয়ে ওর হাত ধরে বললাম, চলো যাই।

আমরা পা বাড়ালাম। বাসে উঠবার পাদানিতে আমি পা রাখলাম, হ্যাণ্ডেলটাও ধরলাম। ও-ও পা বাড়াল কিন্তু কি ভেবে বাসে উঠল না। বললে, তুমি যাও, আমি আর যাচ্ছি না।

ও অন্য দিকে চলে গেল।

বাস থেকে ওর চলমান শরীরটাকে দেখলাম। মনে হল ও যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কিম্বা আমিই হয়ত দূরে সরে যাচ্ছি। কোথাও একটা বেশ বড় রকমের গরমিল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। ছোটখাট মনকষাকষি তো ছিলই। এবার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দোষটা কি একা আমার। আমাকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আচ্ছা, বিক্ষুব্ধ জীবনে কি পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় ? গত কয়েক বছর তো আমি স্রোতের তৃণের মত ভেসে চলেছিলাম। এখন ভাল করে ভেবে দেখতে হবে এর অর্থ কি ?

বুকের ভেতর একটা দ্রুত স্পন্দন অনুভব করছি। একটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হৃদয় যেন বলতে চায়—দৃঢ় সংকল্প যাদের মনে আছে, জীবনটা তাদেরই জন্য।

২৩

ড্রেস রিহারসেলের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল সকলের উৎসাহ ততই বেড়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমি অপেরা হলটার এক কোণে গিয়ে বসে থাকতাম। এই হলটাই একদিন লোকে লোকারণ্য হবে। ওদের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে বসে বসে তাই ভাবতে চেষ্টা করতাম। দর্শকরা তো সবাই কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী হবে। ভাবতে ভাবতে মন চলে যেত দূরে, অনেক দূরে।

এ-কদিন আমি বেশ প্রফুল্ল মনে আছি। চলার গতিতেও যেন একটা ছন্দ পাচ্ছি। মনের আনন্দে আমিও সকলের সঙ্গে আমাদের ডরমিটারীর মেজে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছি, সাফ করতে শুরু করেছি। ধুয়ে মুছে একেবারে ঝকঝকে করে রাখছি। আমাদের স্টাডি রুমের চেহারাও বদলে দিয়েছি। মাঝে মাঝে কিচেনে গিয়েও হাত লাগাই। প্রচুর কর্ম-শক্তি পেয়ে গেছি। এ শক্তির কোন শেষ নেই। কেন জানি না সব কিছুই এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে।

পাই পিং-এর কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়। মনে পড়ে ও আমার জন্য কত কি করেছে। ও আমাকে ভালবাসে। সব সময় আমার মঙ্গল কামনা করে। আমার ভয় হয়, আমি বোধহয় ওর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারছি না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় ও কেমন যেন অন্য প্রকৃতির লোক। ও সব সময় নিজের খুশিতে চলে। আমি কি চাই, কি ভাবি, এসব বুঝবার চেষ্টা ও কোনদিন করেছে বলে মনে হয় না। তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ও কি সত্যি সত্যি আমাকে ভালবাসে। ও কি সত্যি সত্যি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী! আমার স্বাধীন সত্তাকে ও কোনদিন সুনজরে দেখেনি। তাকে দাবিয়ে রেখে ও আমাকে ওর মত করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা করতে পারেনি, আমি তা করতে দেইনি। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছি; তা ও জানে এবং টের পেয়েছে। আচ্ছা, ওর মনে কি কোন পরিবর্তন এসেছে? আমার তো

তা মনে হয় না। আচ্ছা, আমিই বা কেন বুঝতে পারছি না ও-ই আমার উপযুক্ত নয়। বরাবর ও সেই এক রকমই আছে। আমিই কি বদলে গেছি? আমিই কি বিদ্রোহী? ভাবছি এ আমার কি হল! জড়িয়ে আছে বাধা, ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগে।

এইসব চিন্তাগুলোই মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। আগে কোন বিষয়েই আমার কোন গভীর আগ্রহ ছিল না। আমি শুধু দর্শক ছিলাম, শুধু দেখে যেতাম। কিন্তু এখন শুধু দেখছি না, দেখার সঙ্গে চিন্তাও করতে হচ্ছে। এখন মাথাটা শুধু ঘুরছে, মনের ভেতরও ঝড় উঠেছে।

২৪

ড্রেস রিহারসেল বেশ ভালভাবে হয়ে গেল। এমন সুন্দরভাবে হল যে আর একবার রিহারসেল দেবার প্রয়োজন হল না। এবার স্টেজে।

বসন্ত উৎসবে এবার মোট তিনখানা নাটক দেখানো হবে। ইউনিভার্সিটি থেকে একটা, সায়েন্স কলেজ থেকে একটা এবং আমাদের কলেজ থেকে আমাদের-টা। আমাদের নাটকটাই প্রথম স্টেজে যাবে।

আমাদের নাটকটা দেখার জন্য আমি বাবাকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম। তিনিও দেখতে যাবেন বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমার মেয়ে স্টেজে কি রকম বাহাদুরী দেখায় তা দেখতে নিশ্চয় যাব।

একটা টিকিট আমি পাই পিংকেও পাঠিয়েছিলাম। বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম ও যেন নিশ্চয় আসে। নিছক সৌজন্যবোধ থেকে যে টিকিটটা পাঠিয়েছিলাম ঠিক তা নয়। পাই পিং আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, অথবা আমিই তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। এই দূরত্ব যাতে কমতে শুরু করে এ রকম একটা ইচ্ছাও এর ভেতর প্রচ্ছন্ন ছিল। ওকে নতুন করে পাওয়া যায় কিনা, আমার মত করে পাওয়া যায় কিনা, সে রকম একটা বাসনাও আমার মনে ছিল এবং এই

উপলক্ষ্যটা সেই কাজে সহায়ক হবে বলেই মনে হয়েছিল। আসল কথা হল আমি আমার হাত বাড়িয়েই রাখব।

২৫

বসন্ত উৎসবের প্রথম রাত্রি। শুরু হবে আমাদের নাটক দিয়ে। আমরা তৈরি হচ্ছি। দর্শকদের আগমনে হল ভরে গেছে। গুঞ্জন কলরব উঠছে, সমস্ত হলটাই গমগম করছে। আরম্ভ হবার ঘণ্টা বাজল, স্টেজে পরদা উঠে গেল। অভিনেতা-অভিনেত্রী তো আমরাই, সকলেরই পরিচিত। তাই আমরা এক এক করে স্টেজে আসতেই সকলে বেশ হর্ষ-ধ্বনি করে আমাদের অভিনন্দন জানাল। আর ড্রামা আরম্ভ হতেই সকলে একাগ্রচিত্ত হয়ে গেল। দর্শকরা কখনো হাসল, কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কখনো আবার হাততালি দিয়ে আমাদের উৎসাহ দিতে লাগল। দর্শকদের এই আচরণে আমরাও বেশ উৎসাহ পেলাম, একটু গর্বও বোধ করলাম।

ড্রামাটা খুব বড় ছিল না। চার অংকে শেষ। শেষের অংক শেষ হবার সময় অর্থাৎ যবনিকা পড়বার সময়, আমাদের চিকনকণ্ঠী জি লাই হঠাৎ মহাউৎসাহিত হয়ে স্টেজে ঢুকে নিজের থেকে একটা ওয়াল্টজ নাচ শুরু করে দিল। এটা আমার নাটকের কোন অংশ ছিল না, তবু ওর উৎসাহে কেউ বাধা দিল না। ওর নাচের তালে তালে দর্শকরাও তাল ঠুকতে শুরু করে দিল। মধুরেন সমাপয়েৎ বলে যে একটা কথা আছে তাই হল।

ড্রামার শেষে আমরা স্টেজের পেছনের ঘরে চলে এলাম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এ ওকে জড়িয়ে ধরে সকলেই সকলকে অভিনন্দন জানাতে লাগলাম। আর এই হৈ-হুল্লোড়ে আমাদের মেক-আপ লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। সবাই বেশ খোশ মেজাজে। গ্রীনরুম সরগরম হয়ে উঠল।

জিয়া গুইচি হলে দর্শক হিসাবে ছিল। সেও গ্রীনরুমে এসে হাজির হল। জিয়ার পিছন পিছন পাই পিংও ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই আমাকে ডেকে বললে, লি জিয়াও, তোমরা এই হল্লোড় বন্ধ কর। তোমার বাবা হয়ত খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বারে বারে মাথা নাড়ছিলেন। আর যখন নাচটা শুরু হল তিনি উঠে সোজা বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পাশেই বসেছিলাম। সব লক্ষ্য করছিলাম।

পাই পিং-এর মুখখানা গম্ভীর, বিরক্তি মাখানো। ওর কথা শুনে আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমার বাবা হলেন পার্টি সেক্রেটারী। ছাত্রছাত্রীদের কাজ-কর্মের ওপর নজর রাখেন, রিপোর্টও দেন। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ড্রামাটা ঠিক মত হয়নি। কিন্তু এ-রকম তো হবার কথা নয়। বাবার আবার কি হল।

সকলের মনেই একটা দুশ্চিন্তা এসে গেল।

এই সময় আমাদের স্টেজ ডিরেকটর একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকলেন। আমার হাতে ফুলের তোড়াটা দিয়ে বললেন, তোমার জন্য। একজন দর্শক-ছাত্র এটা তোমার হাতে দিয়ে দিতে বলেছেন।

আমি আড়চোখে পাই-এর দিকে তাকালেম। সে এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল। একটু সংকোচ করে আমি ফুলের তোড়াটা নিলাম। যা ভেবেছিলাম, একটা ছোট চিঠিও ফুলের সঙ্গে ছিল। আমি এক কোণে গিয়ে একটু আড়াল করে চিঠিটা খুলে পড়লাম। দু' লাইনের চিঠি : প্রিয় মিস লি, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি অতিশয় আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার এই ড্রামা সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আপনার জীবনও যেন এই রকম আনন্দে ও সাফল্যে ভরে থাকে।

লেখকের নাম ছিল না, তবে হাতের লেখাটা আমার পরিচিত।

পাই বিষাদ বদনে সন্দিগ্ধ নয়নে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি একটু ইতস্তত: করে চিঠিখানা ওর হাতে দিলাম। ওর কাছে লুকোবার চেষ্টা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এবার সে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করবে, আগের মত মূর্তি দেখাবে না।

পাই প্রথম থেকেই রেগে ছিল। চিঠিখানা পড়ে আরো রেগে গেল।

চিঠিখানাকে মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে রাখল। তবে মুখে কিছু বলল না। এত লোকের সাথে মেজাজ দেখানো উচিত হবে না বিবেচনা করেই হয়ত চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে কিউ চিনের সঙ্গে কি কথা বলে দু'জনেই এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ওদের মতলবটা ঠিক বুঝতে না পেরে আমিও ওদের পেছনে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। জি লাই এসে আমাকে ধরল। বললে, আমি নিজেই তোমার বাবার কাছে যাব এবং বলব ওয়াল্টজ নাচটা ড্রামার কোন অংশ নয় এবং এর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। আমাকে আপনারা ক্রিটিসাইজ করুন, আমি সব অপরাধ স্বীকার করে নেব।

জিয়া গুইচি বললে, আমিও কাছাকাছিই বসেছিলাম। সেরকম কিছুতো আমি লক্ষ্য করিনি।

মোটা গংগ বললে, এমনভাবে মুষড়ে পড়লে চলবে না। ড্রামাটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তার বিচার করবে দর্শকরা। একজনের মতামত দিয়ে তার বিচার করা যায় না।

আমি সায় দিয়ে বললাম, গংগ ঠিক কথাই বলেছে।

এই বলে আমি জি লাই-এর হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে এলাম।

বাইরে এসে দেখি চাঁদের আলোয় একটা ল্যাম্প পোষ্টের নীচে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। কিউ বেশ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পাই বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলে যাচ্ছে। শেষের কথাগুলো আমিও শুনতে পেলাম। পাই বলে যাচ্ছিল, পরিশেষে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, লি অতি সরল প্রকৃতির মেয়ে, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। তার কোমল মনকে সহজেই অভিভূত করা যায় আর তুমি তাই নিয়ে খেলা খেলছো। তুমি অপদার্থ, তোমার কোন জীবনাদর্শ নেই ; বিবেক বলে কিছু নেই—এই বলে পাই হন্ হন্ করে একদিকে চলে গেল।

পাই-এর শেষের কথাগুলো শুনে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। কিউর কথায় সম্বিত ফিরে এল। আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, ভেতরে চলো, ওরা সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কথাটা ও এমনভাবে বললে যেন বিশেষ কিছুই হয়নি। তবে ওর গলার স্বর ভাঙাভাঙা বলে মনে হল। কি জঘন্য পরিস্থিতি।

হলের ভেতর ঢুকেই কিউ দ্বাররক্ষীকে একটা সিগ্রেট দিতে বলল। সিগ্রেটটা ধরিয়ে ও খুব জোরে জোরে টানতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই খকখক্ করে কাশতে লাগল। আমি খুব আস্তে বললাম, সিগ্রেট খেয়োনা। এই বলে ওর মুখের সিগ্রেটটা টেনে ফেলে দিলাম।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, কী অসীম ধৈর্য সহকারে ও নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করছে।

সকলের শুকনো মুখের দিকে চেয়ে ওদের মনে একটু সাহস দেবার জন্য কিউ বললে, কমরেড্স, আমার মনে হয় এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আজকের অভিনয় খুব সুন্দর এবং সফল হয়েছে। তবু সাধারণ লোকদের মতামত এবং সমালোচনা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমি স্থানীয় ড্রামা সোসাইটি এবং খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব এবং তাঁদের অভিমত জানবার চেষ্টা করব। তোমরা সবাই জনসাধারণের অভিমত জানবার চেষ্টা করবে। আর লি, তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে আমাদের ড্রামা এবং অভিনয় সম্বন্ধে তিনি সত্যি সত্যি কি মনে করেন। আমাদের এখন চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

কিউর আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহ দেখে আমাদের থমথমে ভাবটা কেটে গেল। মনটা একটু হালকা হল। কিন্তু যে নৈরাশ্য আমার মনের ভেতর জমছিল তা দূর হল না। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদকেও বেশ ম্লান বলে মনে হল।

কিউ আমার দিকে তাকিয়ে অসংকোচে বললে, তোমাকে একটা কবিতার দুটো লাইন শোনাই :

সমুদ্রে যদি ঝড় না-ই উঠত,
তাহলে তার বিশালত্বের মহিমা কে গাইত ;
দুঃখ আঘাত যদি জীবনে না-ই আসে
তাহলে কবিতার জন্ম হত কেমন করে !

বল তো কবিতাটা কার লেখা ?

২৬

বাড়ী এসে আমার প্রথম কাজ হল বাবাকে সামলানো। ওরা আমার ওপর একটা গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। মোটা গংগ-এর কথায় পাথর চিপে জল বের করতে হবে। বাবাকে ওরা সকলে বেশ ভয়ের চোখে দেখে। কিন্তু বাবাকে আমি সেরকম ভয় করি না। কারণ বাবার কাছে আমি তার আদুরে মেয়ে। কিন্তু আজ বুকটা বেশ দুরুদুরু করছিল। কারণ, আজ আমি নিজের কোন আব্দার নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি না। আজ যাচ্ছি সকলের হয়ে ওকালতি করতে। আমাদের ড্রামা ক্লাবের মান রক্ষা করতে। তাই খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে বাবার ঘরের দিকে গেলাম এবং দরজার কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিভাবে কথাটা আরম্ভ করব তাই মনে মনে ঠিক করতে লাগলাম।

তারপর আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলাম। এ-রকমভাবে দরজায় টোকা আমি আগে কোনদিন দেইনি। যখনি বাবার কাছে যাবার দরকার হয়েছে তখন সোজাসুজি দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর চলে গেছি। দরজায় টোকা দেবার আদব-কায়দার কোন প্রয়োজনবোধ করিনি। আজ কেন যে দরজায় টোকা দিলাম নিজেই জানি না। তবে এত আস্তে দিয়েছিলাম যে মনে হল বাবার কানে শব্দটা যায় নি। কারণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ভেতরে আসবার আহ্বান শুনলাম না। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাতলটা ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ঘরে ঢুকে দেখি বুড়োদের আসর বসেছে। বাবা তাঁর পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে আসর জমিয়েছেন। খুব হাসি গল্প চলছিল। এঁদের সকলকে আমি চিনি না, তবে এঁরা সকলেই আমাকে চেনেন। আমি সকলকে নমস্কার জানিয়ে এক কোণে বসে পড়লাম। বাবা বেশ খোশ মেজাজে আছেন দেখে মনে বেশ আশা হল। সহজেই কার্যোদ্ধার হবে। আমি সেই সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইলাম।

বাবার এক বুড়ী কমরেড এই সুযোগ করে দিলেন। মহিলাটিকে বুড়ী বললাম এই জন্য যে, তার মাথার সমস্ত চুলই পাকা, একেবারে ধবধবে সাদা। তিনি হঠাৎ কপট ভর্ৎসনা করে বাবাকে বললেন, তোমার এই মেয়েটাও আমাকে মাসি বলে ডাকে। আমার মতে কাজটা মোটেই উচিত হচ্ছে না।

বাবা কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, তাহলে কি বলে ডাকবে?

—কেন, দিদিমা বলতে পারে!

বুড়ীর কথা শুনে সবাই তার মুখের দিকে তাকাল।

আর একজন মহিলা, তাকে ঠিক বুড়ী বলা চলে না, মাথায় সাদায়-কালোয় মেশানো চুল। বললেন, তোমার মতলবটা কি বলতো? কাকে ল্যাং মারতে চাও?

বুড়ী বাবার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, তুমি কি সত্যি সব ভুলে গেছ?

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, হয়ত ভুলে গেছি কিম্বা তুমি হয়ত একটা গল্প বলবার ভূমিকা করছো।

—বটে বটে, আমি গল্প বানাচ্ছি। তবে দেব নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে? বলে দেব আসল কথাটা? আমায় কিন্তু দোষ দিতে পারবে না, এই বলে বুড়ী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

চা-পান শেষ করে বুড়ী চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটু কেশে গলাটা সাফ করে বলতে লাগলেন, তাহলে তোমরা সকলেই শোনো। আমরা তখন ইনান মিলিটারী ও পলিটিকাল একাডেমীতে ট্রেনিং নিচ্ছি। তুমি (বাবাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) ছিলে আমাদের একজন ইনসট্রাকটর আর আমি ছিলাম মেয়েদের ক্লাশের মনিটর। জায়গাটা ছিল নির্জন পাহাড়ী অঞ্চল আর আমরা থাকতাম তাঁবুতে। রাত্রিবেলা আমরা মেয়েরাই পালা করে পাহারা দিতাম। মাঝে মাঝে হত কি তোমরা এসে হামলা করতে। আচমকা এসে যে মেয়েরা পাহারা দিচ্ছিল, তাদের ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে। সকালে উঠে আমাকে তাই অফিসে গিয়ে আত্মসমালোচনা করতে হত, দোষ স্বীকার

করতে হত, ক্ষমা চাইতে হত এবং মেয়েদের ফিরিয়ে আনতে হত। তোমার জন্যই আমাদের মেয়েরা এই দুর্ভোগ ভুগত।

বুড়ীর কথা শুনে বাবা একগাল হেসে বলে উঠলেন, আরে ওটাতো ছিল একটা সামরিক একসারসাইজ, অ্যামবুসের অনুশীলন। তখন সময়টা কি রকম ছিল দেখতে হবে তো!

বুড়ী বলে উঠলেন, তুমি চুপ করতো! আমাকে বাকীটা বলতে দাও। ওই রকম অ্যামবুস মাঝে মাঝে হত বলে আমরাও ঠিক করলাম এর পাল্টা জবাব দিতে হবে। আমরাও তাই দলবেঁধে সারারাত জেগে অন্ধকারে বসে থাকতাম, কখন ওরা হামলা করতে আসে দেখবার জন্য আর ওদের ধরবার জন্য। আমাদের সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকতো না তবে রেশনের বড় বড় বস্তাগুলো ছিল। একদিন রাতে যেই ওরা হামলা করতে এসেছে, আমরা সবাই মিলে ওদের ঘিরে ফেললাম আর ওদের একজনকে ধরে একটা বড় বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে বন্দী করে ফেললাম। আর সব পালালো। ওকে বস্তাবন্দী করে আমাদের তাঁবুর ভেতর নিয়ে এলাম। ওকে শাসিয়ে বললাম, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, আর এমন কাজ কোনদিন করবে না প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাছাড়া আমাদের সম্মান দেখাবার জন্য আমাকে মাসি বলে ডাকতে হবে। ও কিছুতেই রাজী হয় না। তখন আমাদের সঙ্গে লাঠি বা বেত কিছুই ছিল না। তাই আমরা পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে তাই দিয়ে দমাদম বস্তা পেটাতে লাগলাম। কয়েক ঘা পিঠে পড়তেই সুর সুর করে বলে উঠল, মাসি গো মাসি, বড্ড লাগছে। ক্ষমা চাইছি, ছেড়ে দাও। আর এমন কম্ম করব না। পরের দিন অবশ্য অফিসে গিয়ে আমাদের দু'জনকেই নিজনিজ কাজের জন্য নিন্দা করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

বুড়ীর কথা শুনে ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

হাসির হর্‌রা একটু কম হলে বুড়ী আবার বললেন, তাহলে ভেবে দেখ, তুমি যদি আমাকে মাসি বলতে পার তাহলে তোমার মেয়েটা কেন দিদিমা বলবে না? আমি কি অন্যায় কিছু বলছি? তুমি তো তখন বস্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাকে মাসি বলে ফেললে। তার যে কি

পরিণাম হতে পারে তা-কি ভেবে দেখেছিলে ?

একটা মস্ত বড় সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম। এ-সুযোগ আমি ছাড়লাম না। বলে উঠলাম, ভারী চমৎকার একটা গল্প। আচ্ছা বাবা, এই গল্পটা যদি লিখে ফেলি তাহলে কি তোমার বদনাম হবে ?

বুড়ী বলে উঠলেন, তা কেন হবে ! সেই সময় আমাদের জীবনই ছিল এই রকম। অবশ্য অনেক ঝক্কি-ঝামেলাও ছিল তবে তার সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তিও কম ছিল না। তুমি যদি গল্প লেখো তাহলে এই ধরনের গল্পই লিখবে। বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে চমক লাগাবার চেষ্টা করবে না।

বাবা বুড়ীকে বললেন, তুমি দেখছি আমার মেয়ের কথায় নেচে উঠেছ। আমার মেয়েও একটা নাটক লিখে ফেলেছে। খুব ভাল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবে তোমার মত প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছে।

তারপর বাবা আমাকে বললেন, আমাদের এই কমরেড এখন হলেন আমাদের প্রাদেশিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তুমি তোমার লেখাটা এঁকে দেখাতে পার। এ-সব বিষয়ে ইনি হলেন পাকা জহুরী। দেখেই বলে দিতে পারবেন সাহিত্য জগতে তোমার স্থান কোথায়।

বাবার কথা শুনে বুড়ীর মনেও বেশ একটু আগ্রহ জেগে উঠল। তিনি যেন আমাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। আমার একটা হাত ধরে বললেন, তোমরা তরুণের দল, আমাদের ল্যাং মারবার চেষ্টা করবে তাতে আমরা ভয় পাই না। তোমার লেখাটা আমাকে দিয়ো, পড়ে দেখব। যদি ভাল কিছু পাই তাহলে নিশ্চয় সমর্থন করব। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে মতের মিল নাও যদি হয় তাহলেও ছাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সবাই পড়বে, আলোচনা করবে, সমালোচনা করবে। সেটা কেমন হবে, তুমি কি বল ?

আমি ফস করে বলে উঠলাম, তোমাকে আমি দিদিমা বলেই ডাকব।

পিঠে একটা মিষ্টি কিল খেলাম।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবার কথা। এতবড় সুখবরটা কিউকে এখনি জানানো দরকার। যে ভয় নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকেছিলাম, তা কোথায় উড়ে চলে গেল। আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

২৭

পাই পিং-এর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। শুধু ঝগড়া নয়, একেবারে বিচ্ছেদও হয়ে গেল বোধহয় সারা জীবনের মত। এই রকম একটা আশংকা কিছুদিন থেকেই মনে জাগছিল। আজ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পাই-ই আরম্ভ করল। উগ্র মূর্তি, রুক্ষ স্বর, জিজ্ঞেস করল, আমি জানতে চাই এবং তোমাকে সত্যি করে বলতে হবে কিউ চিনের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি ?

ওর প্রশ্ন শুনে আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠল। এই প্রশ্নটাই ও অন্যভাবে করতে পারতো, মোলায়েম করে বলতে পারতো, একটা সত্য কথা বলবে ? কিউ চিনকে তোমার কেমন লাগে ? তাহলে আমিও নিসংকোচে জবাব দিতে পারতাম, ওকে আমার বেশ ভাল লাগে ; ও কাছে থাকলে অনেক উৎসাহ পাই। এবং ব্যাপারটা এখানেই হয়তো মিটে যেত। কিন্তু তা না করে ও আমাকে কৈফিয়ত তলব করতে এসেছে, আমি যেন একটা মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

আমি তাই ওর প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে ওরই মত মেজাজ দেখিয়ে বললাম, তোমার এ-রকম প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। তাছাড়া এ-রকম প্রশ্ন করবার অধিকার তোমায় কে দিল ?

এ-রকম জবাব ও আশা করেনি। প্রথম থেকেই তো রেগে ছিল, এবার ক্ষেপে উঠল। বললে, কি বললে ? তোমার জন্য আমি এত করি আর একটা সামান্য প্রশ্নও আমি করতে পারব না ?

বললাম, প্রশ্নটা সামান্য নয়। ওটা তোমার নোংরা মনের নোংরা প্রশ্ন।

টেবিলের ওপর একটা বিরাট ঘুষি মেরে পাই চেঁচিয়ে উঠল, তুমি জান না, তুমি বুঝতে পারছ না, লোকটা তোমাকে ঠকাচ্ছে, তোমাকে নিয়ে খেলা করছে।

আমার মাথাও গরম হয়ে উঠল। আমিও ওর মতই চেঁচিয়ে বললাম, তুমি ঠিকই বুঝেছ এবং আমিও স্বীকার করছি তোমার অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

প্রবল উত্তেজনায় পাই কাঁপছিল, হাঁপাচ্ছিল। একটু দম নিয়ে বললে, ও বুঝেছি। তোমার ভেতরটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আগেই ভাবা উচিত ছিল।

আমিও জবাব দিলাম, আমিও তোমার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

জ্বল জ্বল চোখে পাই আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর নিজের মনেই বলে চললো, কারখানায় নানাভাবে তোমাকে রক্ষা করেছি, এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছি; কালচারাল রিভলিউশনের অন্ধ রোষ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি আমারই জন্য, আর আজ তুমি……

আমি ঠিক করেছিলাম, আজ আর নীরব থাকব না। আমিও বললাম, সে তো তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্যই করেছো।

পাই বসে বসে গজরাতে লাগল। হঠাৎ মনস্থির করে বললে, চলো, তোমার বাবার কাছে যাই। না, থাক। আমি তোমাদের কলেজে যাব। তোমাদের কর্তৃপক্ষকে সব খুলে জানাব; তোমার আচরণ তাঁরাই বিচার করবেন। তোমাদের ইউনিয়নে যাব···

তখনি বসে বসে পাই তার প্ল্যান ঠিক করে ফেলল কিভাবে সে আমাকে জব্দ করবে। আমিও বলে দিলাম, যেখানে খুশি তুমি যাও, যার কাছে খুশি নালিশ করো। আমাকে আর বিরক্ত করতে এসো না।

পাই চলে গেল। আমি জানালায় হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর চলে যাবার পায়ের শব্দ কানে বাজতে লাগল।

এ-রকম একটা কিছু হবে, এ রকম একটা আশংকা কিছুদিন থেকে আমার মনে জমছিল। কিন্তু সত্যি এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

২৮

পাই পিং-এর সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করাটা বোধহয় উচিত হয়নি। মাঝে মাঝে আমি খুব অধৈর্য হয়ে পড়ি। তখন মাথাটা ঠিক থাকে না। পাই পিং-এর সঙ্গে আগেও অনেক ঝগড়া করেছি। আবার সে ঝগড়া মিটে গেছে। তবে এবার বোধহয় আমাদের ঝগড়া আর মিটবে না। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা আছে—এবার পাই বোধহয় একটু ঠাণ্ডা হবে, এবার বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করবে যে, আমারও একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আমি ওর ঠিক খেলার পুতুল নই। কিন্তু পাই পিং এখন ডেপুটি ডিরেক্টর, তার মেজাজই আলাদা।

প্রথমে পাই আমার বাবার কাছে নালিশ করল। তারপর নালিশ করল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপর আমাদের ইউনিয়নে। ড্রামা ক্লাবেও গিয়েছিল তবে সেখানে কিছু সুবিধা করতে পারেনি, তা আন্দাজে বুঝতে পেরেছিলাম।

বাবা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, পাই এমন কি অপরাধ করেছে ?

আমি একটা জবাব দিতে পারতাম কিন্তু দিলাম না। কারণ, প্রশ্নটা শুনেই বুঝতে পারলাম বাবা খুব রেগে আছেন। আর এই সময় কোন কথা বললেই তিনি আরো রেগে যাবেন। তাই চুপ করে রইলাম।

আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি বললেন, তুমি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছো।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সেঘর থেকে চলে এলাম।

কালেজ কর্তৃপক্ষ আমায় ডেকে এক ঘণ্টা উপদেশ দিলেন। তাদের উপদেশ শুনে বুঝতে পারলাম, কালচারাল রিভলিউশনের সময় চরিত্র হননের যে প্রবণতা ছিল—পাই আমার বিরুদ্ধে সেই ফরমুলাই প্রয়োগ করেছে। পাই পিং একটা চরিত্র বটে।

ইউনিয়নের সেক্রেটারী অবশ্য আমায় কিছু বললেন না, তবে ক্লাশের সব মেয়েরাই জেনে গেল। আমায় দেখলে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে হাসে। আমাকে সবই সহ্য করতে হয়।

জিয়া গুইচি পাই পিং-এর হয়ে অনেক ওকালতি করল। আমাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল। পরিশেষে মন্তব্য করল যে, কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে।

তারপর নানারকম গুজব ছড়াতে লাগল। মুখে কেউ কিছু বলে না, আড়ালে আমাকে নিয়েই আলোচনা হয়। আমাকে সবই সহ্য করতে হল। কিন্তু চিকনকণ্ঠী জি লাই এসব সহ্য করতে পারল না। সে আমাকে সমর্থন করে বললে, তুমি চুপ করে আছ কেন? প্রতিবাদ কর। জোর গলায় সকলকে জানিয়ে দাও যে, পুরুষদের হাতে আমরা খেলার পুতুল নই।

আমি ভাবছি স্রোতের তৃণের মত আমরা সকলেই কি ভেসে ভেসে চলেছি, না, জীবনের একটা অর্থ আছে।

২৯

মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। ঠাণ্ডা মেজাজে বসে বসে আগাগোড়া ঘটনাগুলো ভেবে দেখছিলাম। পাই পিং-এর আচরণ বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলাম যে, ওর পক্ষে এই রকম আচরণ করাই স্বাভাবিক। কারণ ওর মনে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, আমার ওপর ওর পূর্ণ অধিকার আছে। আর এইরকম একটা ধারণা ওর মনে কেন এবং কেমন করে জন্মালো তা ভাবতে গিয়ে দেখলাম দোষটা আমারই। ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি অনেক কিন্তু তার চাইতে সহ্য করেছি অনেক বেশী। কারণ ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা একরকম প্রায় স্থির হয়েই ছিল। বাবার ইচ্ছা এবং ওরও ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কিছু ছিল না, তবে বিয়ের নামে মনে বোধহয় একটু পুলক জাগতো। পাই পিং-এর এ-রকম আচরণের

আর একটা কারণ হল ও এখন ডেপুটি ডিরেক্টর হয়েছে, কিছুদিন পরে হয়ত ডিরেক্টর হয়ে যাবে। ডেপুটি ডিরেক্টর না হয়ে ও যদি একজন সাধারণ কর্মচারী হয়েই থাকতো তাহলে ওর আচরণ বোধহয় এত দাম্ভিক হত না। প্রভুত্বের মানসিকতাই ওকে পেয়ে বসেছে। ওর জন্য সত্যি একটু দুঃখ হয়, একটু লজ্জাও অনুভব করি। ওকে আর ভালবাসতে ইচ্ছা হয় না।

ভালবাসা! আমি কি সত্যি ওকে ভালবাসতে পেরেছিলাম! আমি কি ভালবাসতে পারি? ভালবাসা জিনিসটা যে কি, আমি কি তা জানি? আমি তো সর্বদা কর্তব্য পালন করে গেছি। ভাল কাজের জন্য প্রশংসা পেয়েছি, অবহেলার জন্য ভর্ৎসনা শুনেছি, বিপদে সাহায্য পেয়েছি। আমি তো কারো কাছ থেকে ভালবাসা পাইনি। না, যা পেয়েছি তারই নাম হয়ত ভালবাসা! আচ্ছা, ভালবাসাও কি একটা কর্তব্যের ভেতর ধর্তব্য! রুটিন করে কি ভালবাসা জানানো যায়!

জিয়া শুইচিকে একদিন উপদেশ দিয়েছিলাম, কখনো বিশ্বাস হারাবে না। আমিও পাই পিংকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সত্যি কি বিশ্বাস করেছিলাম! আসলে ওর বাইরের চাকচিক্য আমার মনকে ভুলিয়েছিল। না, আমার মনে আজ আর কোন সংশয় নেই। আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজের হাতেই তুলে নিলাম।

একখানা চিঠি পেলাম। পাই পিং লিখেছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম। তারপর এক সময়ে খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম।

লি,

আমি ভাবতেও পারছি না যে, এইভাবে আমাদের বিচ্ছেদ হবে। প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমার এই উদ্বেগহীন শান্ত

জীবনে এত বড় একটা আঘাত পাব। স্বপ্নেও ভাবিনি, সেই আঘাতটা পাবো তোমারই কাছ থেকে—যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ভালবাসার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আমি যে কত দুঃখ পেয়েছি, তা ভাষা দিয়ে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

আমি আজ পর্যন্ত কোন অন্যায় কাজ করিনি, কোন অপরাধ করিনি। তোমাকে শুধু একটু অতিরিক্ত ভালবাসতাম। তার পরিবর্তে তোমার কাছ থেকে শুধু অবহেলাই পেয়েছি। অতিরিক্ত ভালবাসতাম বলেই তুমি পদে পদে আমাকে অপদস্থ করবার সাহস পেয়েছ। অতিরিক্ত ভালবাসতাম বলেই আমি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। অতিরিক্ত ভালবাসতাম বলেই সেদিন আমি মাত্রা হারিয়ে ফেলেছিলাম, উত্তেজিত হয়েছিলাম এবং সেই উত্তেজনার মুহূর্তে যে আচরণ করেছিলাম তার জন্য আজ আমি সত্যি অনুতাপ করছি। যদি পার আমাকে ক্ষমা করো।

এখন আর সে উত্তেজনা নেই। এখন ঠাণ্ডা মেজাজে সমস্ত ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করছি। আমি জানি তুমি সামান্য সাধারণ মেয়ে নও। আমার মনে হয় কোথাও অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে, যার জন্য আমার একটা মানসিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে এসেছে। আমার মনে হয় আমার অন্ধ ভালবাসাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। তোমার রূপে, তোমার সৌন্দর্যে, তোমার নম্র স্বভাবে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার চোখে তুমি ছিলে আদর্শ নারী। আমিও মনে-প্রাণে চেষ্টা করেছিলাম, তোমার চোখে আদর্শ পুরুষ হবার জন্য। তোমাকে রক্ষা করার এবং সর্বপ্রকারে তোমাকে সুখী করার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে সুখী করতে আমি পারিনি। তোমাকে ভালবেসে আমি গর্ব অনুভব করতাম। তুমি আমার সমস্ত গর্ব ভেঙে দিয়েছ। আজ ঠাণ্ডা মাথায় বসে বসে এইসব কথাই ভাবছি। ভাবছি এ-রকম কেন হল!

আজ আমি নিজের সাথে বোঝাপাড়া করছি। আমি বুঝতে পারছি, আমার মন অতিশয় সংকীর্ণ, উদার মনোভাব আমার ভেতর নেই। বন্ধুদের ভেতর মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হয় কিন্তু তাতে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

কারণ, তখনি একটা সমঝোতার মনোভাব এসে যায় আর পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করে নিজেদের সংশোধন করবার প্রয়াস আসে। তোমার সঙ্গে আমারও বহুবার মনোমালিন্য ঘটেছে। আমি তোমাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি, নিজেকে করিনি। এখন বুঝতে পারছি আমি কোন হিসাবেই তোমার উপযুক্ত নই। আমি অতিশয় অপদার্থ।

আমি ঠিক করেছি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন থেকে আমি নিজেকে সংশোধন করবার চেষ্টা করব, সব রকমে তোমার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করব। তবে এই মানসিক পরিবর্তন সহসা হবার নয়, হয়ত অনেক সময় লাগবে। আমি ধৈর্য হারাব না। ইতিমধ্যে তোমার সুনামে যে কলংক লেপন করেছি তা মুছে দেবার চেষ্টা করব। করব, করব, করব।

তোমাকে আমি বন্ধু হিসাবে হয়ত আর পাব না। তবে তুমি সব সময় আমাকে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলে গণ্য করতে পার।

তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার ছিল, বলবার আছে! সব কথা আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না। তোমার কি মনে আছে—লেকের ধারে বীচ পার্কের সেই বেঞ্চিতে একদিন আমরা দু'জনে বসেছিলাম, আমাদের ভালবাসার প্রথম স্পর্শ সেদিন আমরা অনুভব করেছিলাম। আর একদিন কি সেই লেকের ধারে সেই পার্কে দেখা হয় না? আমার প্রতি যদি তোমার সামান্য একটু করুণা থাকে তাহলে দয়া করে কোনো শনিবারে সেই লেকের ধারে এসো। আসতে না চাও এসো না, আমি জোর করছি না। আমি তোমার মঙ্গল সর্বদাই কামনা করব, ইতি।

তোমার
পাই

চিঠিখানা পড়তে পড়তে কান্না পেয়ে গেল।

৩১

ভেবেছিলাম পাই পিং-এর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্কে গেলাম। লেকের ধারে বেঞ্চটার ওপর ও বসেছিল। শুকনো মুখ, রুক্ষ চেহারা। মনে হল এ-কদিনের ভেতর ও বেশ রোগা হয়ে গেছে।

পার্কে বেশী লোকজন ছিল না। দুপুর বেলা, চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু নিকটের কোন এক কারখানার মেশিন চলার ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কেউ কোন কথা বলতে পারছিলাম না। আমি ভাবছিলাম, কিভাবে কথা আরম্ভ করা যায়। অবশেষে পাই-ই ভাঙা গলায় বললে, আমার চিঠিটা তাহলে তুমি পেয়েছ ?

আমি আমার পায়ের কাছে একটা ঘাসের ফুলকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। সেইদিকে চেয়েই মৃদু স্বরে বললাম, হ্যাঁ, পেয়েছি।

পাই বেশ খেদের সঙ্গে বললে, তোমাকে আমি শুধু দুঃখই দিলাম। আমি একটা মস্তবড় ইডিয়ট।

আমি শান্তভাবে বললাম, ও-রকমভাবে বলছো কেন ? আমি তো তোমার কোন দোষ দেখছি না।

—তুমি দেখছো না, কিন্তু আমি দেখছি। আমার স্বভাব বদলাতে হবে, আমার চরিত্র বদলাতে হবে, আমার আচরণ বদলাতে হবে। আমাকে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

এই বলে ও মাথাগুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আমি বেশ বিব্রত বোধ করলাম। তাড়াতাড়ি আমার রুমালটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, এ-রকম ছেলে মানুষী করো না। মুখ তুলে ভাল হয়ে বসো। এ-রকম করলে আমিও কেঁদে ফেলব।

এই বলে আমি ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম।

ও চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো।

বললাম, এ-রকম ছেলেমানুষী করতে হয়!

পাই আমার চাইতে খুব কম হলেও পাঁচ-ছ বছরের বড়। কিন্তু এখন মনে হল ও অতিশয় ছেলে মানুষ। ওকে প্রবোধ দেবার জন্য বললাম এত ভেঙে পড়ছো কেন? এমন কি হয়েছে! আমাদের বয়স এখন এমন কিছু নয়। সমুখে বিপুল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের স্থান করে নিতে পারব।

ও একটু শান্ত হল। আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আর কিছুই চাই না। আমি শুধু তোমাকে বন্ধু বলেই ভাবতে চাই।

আমি ওর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকালেম।

ও আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আর কিছুই চাই না, আমি তোমাকে জীবন-ভর ভালবেসে যাব।

আমিও বেশ অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। কান্না ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। নিজের মনকে শান্ত করে আস্তে বললাম, চলো, এবার ফিরে যাই।

পাই উঠে দাঁড়াল। আমরা দু'জনেই পার্কের বেঞ্চটার কাছে দাঁড়ালাম। এইখানেই পাই তার ভালবাসার প্রথম চুম্বন আমাকে দিয়েছিল। আজ এই বিদায় মুহূর্তে আমি ওর কপালে আস্তে আলগোছে একটা ছোট চুম্বন দিয়ে দিলাম। পার্কের এই বেঞ্চটাই আমাদের মিলনের এবং বিচ্ছেদের সাক্ষী হয়ে রইল।

৩২

বাবাতো রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন। এখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন। কিন্তু তবু বেশ গম্ভীর মেজাজে আছেন।

বাবারা একটু সেকেলে ধরনের লোক। তাদের একটা মাত্র দুশ্চিন্তা মেয়েদের নিয়ে। মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন সুপাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়েটা হয়ে গেলেই বাবারা নিশ্চিন্ত আর যতদিন না মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ততদিন একটা দুশ্চিন্তা মনের ভেতর থাকবেই। আমার বাবারও এখন আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। পাই পিং বাবার নজরে খুব সুপাত্র ছিল। বাবার দুশ্চিন্তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু বাবা বুঝতে পারছে না যে, দিন-কাল বদলে গেছে। পুরোনো দিনের পুরোনো মানসিকতা নিয়ে এ যুগে আর থাকা চলে না। বাবাকে একথা বোঝাব এ-রকম সাধ্য আমার নেই। বুড়োদের নিয়েই আজকাল আমাদের দুশ্চিন্তা।

কিন্তু বাবার গাম্ভীর্য আমার আর সহ্য হয় না। তাই বাবাকে একটু শান্ত করবার জন্য নিজেকে তৈরী করলাম। বাড়ীতে আমি থাকি সপ্তাহে দেড় দিন। শনিবার বিকেল থেকে রবিবার সমস্ত দিন। এই দেড় দিনে আমি প্রফুল্ল চিত্তে এবং মহা উৎসাহে বাড়ীর সব রকম কাজে মন দিলাম। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ঘর গুছানো, ঘর সাজানো এবং আরো যতরকম কাজ হতে পারে। তার ওপর লেখাপড়ায়ও বেশ মনোযোগ দিতে লাগলাম। শুধু তাই নয়, বাবার লাইব্রেরী থেকে মোটা মোটা বই এনে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বাবা মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেতেন, মুখে কিছু বলতেন না।

এরপরে আমি ধীরে ধীরে বাবার ওপরও খবরদারী আরম্ভ করলাম। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই জোর করে বাবাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিতাম। প্রথম প্রথম বাবা খুব আপত্তি করতেন কিন্তু পরে তাও সহ্য করতে শুরু করলেন। আমাদের সম্পর্কটা এইভাবেই সহজ হয়ে উঠল।

৩৩

দিন চলে যাচ্ছে। সপ্তাহ চলে যাচ্ছে। মাসও চলে যাচ্ছে। আমি ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। অন্য কোন দিকে মন দিচ্ছি না। এবার ভাল করে পাশ করতেই হবে, ফাষ্ট´ ক্লাশ অনার্স পেতেই হবে।

মাঝে মাঝে কিউ চিনের কথা মনে হয়। মাঝে মাঝে আগে দেখা হত। আজকাল আর সেটা হয় না। ওকে এবং আমাকে নিয়ে একটা বদনাম রটেছিল এবং এক সময় সেইটেই ফিস্‌ফিস্ আলোচনার বিষয় ছিল। তাও এখন থিতিয়ে পড়েছে। এখন পরীক্ষার পড়া নিয়ে সকলেই ব্যস্ত।

জিয়া গুইচি মনে খুব আঘাত পেয়েছিল কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি। ও খুব চাপা মেয়ে। মানসিক জটিলতায় ভুগছে। আমি এই জটিলতার উপলক্ষ্য হয়ে থাকতে চাই না। তাই ভাবছি একদিন কিউ চিনের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে সব পরিষ্কার করে ফেলব। আর পরীক্ষার পরেই যাতে জিয়া গুইচির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায় তার একটা চেষ্টা করব। তাহলে একটা বন্ধুর মত কাজ করা হবে।

কিন্তু যতবার কিউ চিনের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি ততবারই একটা সংকোচ এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কেন এই সংকোচ! বদনাম রটেছিল, তাই? না, ভাবতেও আমি লাল হয়ে উঠলাম। আমিও কি কিউ চিনকে ভালবেসে ফেলেছি?

মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠল। ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।

কিউকে আমি বন্ধু হিসেবে দেখেছি, যেন সে আমার ছোট বেলার বন্ধু। তবে ওকে আমি গাইড হিসেবেও পেয়েছি। আর ওকে পেয়েছি ফিলজফার হিসেবে যার প্রভাবে আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এসে গেছে অনুভব করছি। আচ্ছা, এরই নাম কি ভালবাসা!

মনের ভেতর ঝড় উঠছে। আর ভাবতে পারছি না।

৩৪

এক ঝলক ভোরের আলো হঠাৎ এসে মনের জানালায় উঁকি মেরে গেল। স্থানীয় পত্রিকায় আমার নাটকখানা আগাগোড়া ছাপা হয়েছে। সকাল বেলা উঠেই পত্রিকাখানা পেলাম।

সম্পাদকীয় ভূমিকায় লেখা হয়েছে, আমরা যে নাটকটি প্রকাশ করলাম, তা কয়েকজন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীর সমবেত চেষ্টার ফল। কলেজের বসন্ত উৎসবে অভিনীত হয়েছিল। নাটক রচনার প্রচলিত রীতিনীতি অতিক্রম করে তরুণের দাবী নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এদের ঝটিকা প্রবেশ বলা যেতে পারে। এই নাটকটা অনেকের মনে আন্দোলন জাগাতে পারে। আমরাও পাঠকদের মতামত জানবার জন্য উৎসুক রইলাম।

বুড়ী দিদিমা তাহলে একটা কাজের কাজ করে ফেলেছেন। 'তরুণের দাবী' এবং 'ঝটিকা প্রবেশ' কথাগুলো আমার বেশ ভাল লাগল। কথাগুলো গভীর অর্থবহ। তরুণদের দাবী মানতেই হবে। আমরা নিজেদের অধিকারে আত্মপ্রকাশ করেছি। স্বীকৃতি দিতেই হবে।

প্রথমেই কিউ চিনের কথা মনে হল। বহুদিন ওর সঙ্গে দেখা করিনি। ইচ্ছে করেই দেখা করিনি। এখনো ওর কাছে যেতে সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু এত বড় একটা খবর ওকে না জানিয়ে থাকি কি করে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে। তাই মন স্থির করে একটু সাহস সঞ্চয় করে পত্রিকাখানা নিয়ে সোজা ওর ঘরের দিকে চলে গেলাম। তিনটে ব্লকের পরে ওদের ব্লক।

দরজায় টোকা দিতেই শুনতে পেলাম, ভেতরে এস। হঠাৎ কেন যেন মনে হল আমার ভবিষ্যৎ হয়ত এখানেই লুকিয়ে আছে। অতীত থেকে বিদায় নেবার সাহস তো ওই আমাকে দিয়েছে। না, তা বোধহয় নয়। তাহলে আমার জীবনে ওর প্রভাব কিভাবে পড়েছে বা পড়ছে। এইসব কথা মনের ভেতর উদ্বেল হয়ে উঠছিল। বুকটা দুরুদুরু কাঁপছিল,

তা টের পাচ্ছিলাম। দরজাটা ঠেলে আমি আর ঘরের ভেতর যেতে পারলাম না। দরজাটার পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও উঠে এসে দরজাটা খুলল। বললে, দরজা তো খোলাই ছিল।

তারপর আমাকে দেখে বলে উঠল, এই যে ঝড়ের পাখি, ভেতরে এস।

ঘরের ভেতর ঢুকে কোন কথা না বলে পত্রিকাখানা ওর হাতে দিলাম। ও পত্রিকাখানা নিয়ে পাতা উল্টে পড়তে বসে গেল।

ঘরের ভেতর আমরা দু'জন। জানালায় হেলান দিয়ে আমি কিউকে দেখছিলাম। ও বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠছে। বুঝতে পারলাম ও খুব আনন্দ পাচ্ছে। ওর এই আনন্দ দেখে আমিও বুঝতে পারলাম উৎসাহ এবং প্রেরণা আমি ওর কাছ থেকেই পেয়েছি। কিউ-ই যে আমার সকল প্রেরণার উৎস তা-কি ও অনুভব করতে পারে। হয়ত পারে, হয়ত পারে না। মনে একটা সংশয়ের দোলা লাগল।

আমি কিউকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখছিলাম। এ-রকমভাবে ওকে এর আগে দেখিনি। ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ চেহারা, আকর্ষণ শক্তি ··· কিউ হঠাৎ পত্রিকাখানা রেখে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। আমি সচকিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে কিউ আবার পত্রিকার পাতায় মাথা গুঁজল। এবার কিন্তু ওর চোখ লাইন বাই লাইন চললো না, মুখে একটু হাসিও ফুটল না। মনে হল কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছে। কি ভাবছে, কে জানে !

চুপ করে থাকাটা আমার কাছে খুব অশোভন লাগছিল। আমি মৃদুস্বরে বললাম, তুমি একজন সাংঘাতিক লোক !

একটু হেসে কিউ জিজ্ঞেস করল, এ রকম কথা বলছো কেন ?

বললাম, তুমি অন্ততঃ আমাকে একটা ধন্যবাদ জানাতে পারতে। কাজটা খুব সহজ ছিল না।

কিউ বেশ সহজভাবেই বললে, তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার আমি কে ? ধন্যবাদ যদি জানাতে হয় তা এই পত্রিকা সম্পাদককে। তোমার

কাজ তুমি করেছ, ভালভাবে করেছ বলা যেতে পারে।

একটু পরেই আবার বললে, তুমিও দেখছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছ।

কিউ সব সময় সোজা ভাষায় সোজা কথা বলে। আমিও তাই আর কোন সংকোচ না করে বলে ফেললাম, এ-কদিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি তা তো জানতে চাইলে না।

কথাটা বলেই বুঝলাম, এ-রকম কথা বলা ঠিক হল না। আমার ব্যাপারে ওকে জড়ানো ঠিক হচ্ছে না। পাই পিং-এর সঙ্গে যে ঝগড়া হল তা তো ওর জন্য নয়। যদিও ও উপলক্ষ্য ছিল কিন্তু এই ঝগড়ার প্রস্তুতি তো অনেক দিন থেকেই চলছিল।

কিউ বললে, জানতে চাইনি এই জন্য যে, আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসা নিজে নিজে করে নিতে পারব।

মনে মনে বুঝতে পারলাম, ও-ও জানতে চায় আমাকে নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কেমন আছি। কিন্তু ও যদি নিজে থেকে জিজ্ঞেস না করে আমিই বা বলি কেমন করে! আমার কাছে তো সমস্ত ঘটনাগুলো বেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। তাই একটুও সংকোচ না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এইসব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে তুমিও তো জড়িয়ে গিয়েছিলে!

কিউ বেশ সহজভাবেই বললে, এটা কি একটা আলোচনার বিষয় হল?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—করো।

কিন্তু ফস করে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

কিউ বললে, চুপ করে আছ কেন? তোমার নিজের কথা?

বললাম, না।

—তা হলে?

কস করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জিয়া গুইচিকে ভালবাস ?

প্রশ্নটা করেই ওর মুখের দিকে তাকালাম। মিথ্যা কথা ও বলবে না এ-রকম একটা বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছিল।

কিন্তু প্রশ্নটা শুনে ও বেশ হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, আমি ··· আমার জন্য কেউ ভাববে, চিন্তা করবে, এ তো আমি চাই না।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। তবে আরম্ভ যখন করেছি তখন এর শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তাই বললাম, আমার ঘটনাগুলো তুমি ভুলে যাও। কিন্তু তুমি একটা সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দিতে পারছো না কেন ?

কিউ এবার বললে, আমার মনে হয় ও আমার মায়ের সেবা-যত্ন করতে পারবে, ঘরের অন্যান্য কাজও করতে পারবে।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি ওকে একজন সেবাদাসী করে রাখতে চাও না ? তোমাকে ও কি চোখে দেখে, জানো ? আর তুমি ওকে সেবাদাসী করে রাখতে চাও !

মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সব পুরুষই কি একই ধরনের, উনিশ আর বিশ। মেয়েদেরকে খেলার পুতুল বলে গণ্য করে। জিয়াকে আমি এই জন্যই তো সাবধান হতে বলেছিলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে কিউ বেশ বিব্রত বোধ করল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, আজ এত বড় একটা সুখবর এনে এ-রকমভাবে ঝগড়া করছো কেন ?

আমিও হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আমার স্বভাবটাই তো ঝগড়া করবার। তাছাড়া জিয়া আমার বিশেষ বন্ধু।

কিউও বললে, জিয়া আমারও গার্ল ফ্রেণ্ড।

—তাহলে ?

কিউ অনেকক্ষণ কি ভাবল, তারপর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললে, তোমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া যায় না। তবে এই পৃথিবীতে

আমাদের সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হয়। বড় বড় আদর্শের কথা দিয়ে জীবনের দৈনন্দিন কাজ ও সমস্যার সমাধান হয় না। আমার মা বাড়ীতে একা থাকেন, আমার বয়সও তিরিশের ওপর চলে গেছে। আমি জিয়া গুইচির কাছে সত্যি কৃতজ্ঞ। সে আমার মত পাড়াগেঁয়ে দরিদ্র ঘরের এক ছন্নছাড়া স্বভাবের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। আর আমিও এমন হতভাগা যে মা'র জন্য একটা বৌ ঘরে এনে দিতে পারলাম না।

বলে ফেললাম, তাহলে বিয়ে করছো না কেন?

কিউ একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, জিয়া গুইচি আমার গার্ল ফ্রেণ্ড!

আমি চুপ হয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ পরে বললাম, তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো? তুমি যদি কোন উপন্যাসের নায়ক হতে আর এই রকম পরিস্থিতি যদি উপন্যাসের ঘটনা হত, তাহলে সমালোচকেরা কি বলতো জানো? বলতো, নায়কের চরিত্রে যতটা দৃঢ়তা আশা করেছিলাম, ঠিক তা পেলাম না মনে হয় নায়ক একটা বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সাহস পাচ্ছে না।

আমার কথা শুনে কিউ একটু হাসল। বললে, তুমি যা ভাবছো ঠিক তা নয়। বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার সাহস বোধহয় আমার আছে।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে খুব আস্তে বললে, কিম্বা বোধহয় নেই।

বলতে বলতে কিউ বেশ গম্ভীর হয়ে গেল।

জীবনটাই তো একটা নাটক, একটা উপন্যাস। কিউ তার নায়ক আর নায়িকা? ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ দরজাটা ঠেলে দুজন পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্র ঘরে ঢুকল। ওরা কিউর সঙ্গে এক ঘরেই থাকে। ওরা কিউর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললে, সেই ল্যানচাউদের কাছ থেকে এসেছে। আচ্ছা, ওরা কি এখনো তোমাকে নিয়ে টানাটানি করছে?

পত্রিকাখানা তুলে নিয়ে ওদের গুডবাই জানিয়ে চলে এলাম।

আজ মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেল। কিউ চিনের চরিত্র আজ আমার কাছে এত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ওকে না ভালবেসে পারা যায় না। ওতো নিজেই বলে ভালবাসার সঙ্গে দায়িত্ব এবং আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার। তাই জিয়া গুইচি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছে জেনেও তাকে বিয়ে করতে পারছে না। কারণ বিয়ে করলে জিয়ার অবস্থা হবে সেবাদাসীর মত। আবার যেহেতু জিয়াকে গার্ল ফ্রেণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাকে অবহেলাও করতে পারছে না। নিজের পায়ে নিজে শেকল বেঁধে বসে আছে।

ভাবছি এই শেকল ভাঙার দায়িত্ব কি আমাকেই নিতে হবে!

৩৫

কদিন থেকে ভাবছি জিয়া গুইচির সঙ্গে বসে একদিন খোলাখুলিভাবে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু ওরও যেন কি হয়েছে।

পত্রিকা অফিস এক গাদা চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। আমার নাটকখানা পড়ে এইসব চিঠি পত্রিকা অফিসে এসেছে। সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে। আমি স্টাডি রুমে বসে চিঠিগুলো দেখছিলাম।

এক খনি-শ্রমিক আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে যে, এই অন্ধকার খনিগর্ভে বাস করেও সে যেন জীবনের একটা সুর খুঁজে পেয়েছে।

এক কারখানা-শ্রমিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে, জীবনের এই সংগ্রামে আমরাও আছি।

আরো অনেক এই ধরনের চিঠি।

জিয়া গুইচি এসে সামনে দাঁড়াল। ওকে দেখে বললাম, বসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

জিয়া একটা চেয়ার টেনে আমার পাশেই বসল এবং বললে, তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, তাহলে তোমার কথাই আগে বল।

জিয়া আমার মুখের দিকে চাইতে পারল না। মাথাটা নীচু করেই বললে, তুমি পাই পিং-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে বলে আমি তোমার নিন্দা করেছিলাম।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলাম, আমাকে আবার সন্দেহের চোখেও তো দেখতে।

জিয়া বললে, ওসব কথা এখন থাক। এখন তুমি আমার নিন্দা করতে পার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেম, তার মানে?

জিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, কিউ চিনের সঙ্গে ঝগড়া করে এলাম। আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি। ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখব না।

ঝগড়া করবার মত মেয়ে জিয়া নয়। তাই জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ তোমার মাথা এ-রকম গরম হয়ে উঠল কেন?

জিয়া ভারী গলায় বললে, সে অনেক কথা।

কাল সারারাত বোধহয় ও কেঁদেছিল। ওর চোখ দুটো এখনো ফোলা ফোলা লাল হয়ে আছে। ওকে একটু প্রবোধ দেব কেমন করে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল?

জিয়া বললে, তোমাকে অনেক আগেই বলব ভেবেছিলাম কিন্তু তখনো কিছু স্থির হয়নি। তুমি তো জানো কিউ এখানে এসেছে কমপিউটার নিয়ে গবেষণা করবার জন্য। ওকে এখানে পাঠিয়েছিল ল্যানচাউ-এর এক প্রতিষ্ঠান। কলেজ কর্তৃপক্ষ ওকে এখানে রাখতে চায়। তাই ল্যানচাউ-এর সঙ্গে অনেক চিঠি লেখালেখি হয়। ও-ও এখানে থাকতে রাজী হয়েছিল। কারণ, তাহলে পোষ্টগ্র্যাজুয়েট পরীক্ষাটাও দিয়ে দিতে পারবে এবং একটা মাস্টার ডিগ্রী পেয়ে যাবে। হঠাৎ ল্যানচাউ থেকে চিঠি এল যে, তারা একটা নতুন, বড় এবং জটিল কমপিউটার আনিয়েছে এবং তার

জন্য কিউকে এখনি দরকার। সামনে পরীক্ষা, বাড়ীতে মা একা আছেন ; এইসব কারণ দেখিয়ে ও ইচ্ছে করলে আরো এক বছর এখানে থেকে যেতো পারতো। আমি কত বোঝালাম। কিন্তু ও তা বুঝলো না। ল্যানচাউ যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেল। আমাকে জানালও না। পুরুষ জাতটাই এই রকম। আমি মরে গেলেও ল্যানচাউ যাচ্ছি না।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, তুমি তোমার পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর ওতো বদলি হয়ে এখানেও আসতে পারে।

জিয়া বলে উঠল, না, তুমি জান না। ও বড় একগুঁয়ে ছেলে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে জিয়ার সব কথা শুনলাম। শেকল তা হলে কিউ এই-ভাবেই ভাঙল। কি গভীর বেদনায় কিউ চিন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জিয়া শুইচি অনুভব করতে পারবে না। কিউর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা আমার মনে জেগে উঠল।

তোমাকে একদিন বলেছিলাম, বিশ্বাস হারাবে না। আজ আবার বলছি, তুমি একটা মস্ত বড় ভুল করছো, এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

জিয়া বলে উঠল, এই কোথায় যাচ্ছো ? আমার জন্য তোমাকে ওকালতি করতে হবে না বলে দিচ্ছি।

বললাম, তোমার জন্য নয়, আমার অন্য কাজ আছে।

—কিন্তু ওকে তো তুমি ধরে পাবে না। ও বোধ হয় এতক্ষণে স্টেশনে চলে গেছে। ল্যানচাউ যাবার ছুটো পঁয়তিরিশের গাড়ীটা ধরবার জন্য।

আমি একটু রাগ দেখিয়ে বললাম, এতক্ষণ এ কথাটা বলনি কেন ?

তারপর তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে দিয়ে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, গেটটা খুলে রাস্তায়, এক দৌড়ে বাসস্টপ। একটা চলন্ত বাসেই উঠে পড়লাম আর হাঁপাতে লাগলাম। আমার ঘড়িতে তখন আড়াইটা বেজে গেছে।

স্টেশনের কাছে এসে বাস থেকে নামতে নামতেই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা শুনতে পেলাম। ভীড় ঠেলে সোজা প্ল্যাটফরমে চলে এলাম। গাড়ী

চলতে শুরু করেছে। প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে গাড়ীটার পেছনে দৌড়তে লাগলাম। ধরি ধরি করেও গাড়ীটাকে ধরতে পারলাম না।

প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ীটা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মত হয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।